সঠিক চিন্তা সঠিক ভাবনা-৫

গর্জে ওঠো হে মুসলিম উম্মাহ!

মূল

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

আবু আবদুর রহমান

সম্পাদনায়

শাইখ আবু আসআ

নিরক্ষণ

শাইখ আবু মুহাম্মাদ কাসেমী

প্রকাশনায়

মাকতাবুল হিকমাহ, ব্যাংলাবাজার

গর্জে ওঠো
হে মুসলিম উম্মাহ!

মূল : শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২১

প্রকাশনায় : মাকতাবুল হিকমাহ

নির্ধারিত মূল্য : ১০০/- (একশত) টাকা মাত্র

সম্পাদক-কথন

বক্ষ্যমাণ বইটি—বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহর হৃদস্পন্দন, মাজলুম উম্মাহর মুক্তির দিশারি, বিশ্ব-তাগুতগোষ্ঠীর যমদূত, রাশিয়া-আমেরিকার জলজ্যান্ত অভিশাপ, তানজিম আল কায়েদার ফাউন্ডার এন্ড কমান্ডার শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহর ঐতিহাসিক ভাষণ 'يا أمة الإسلام' শ্রুতিলিপি-পুস্তিকার সরল বঙ্গানুবাদ।

যিনি বলেছিলেন, আমার হৃদয়-প্রাণ, অনুভব-অনুভূতি ও সমগ্র জীবনজুড়ে রয়েছে জিহাদ, পবিত্র জিহাদ। যিনি ছিলেন বিপ্লবী অনুপ্রেরণার আধার, সফল বিপ্লবের মূর্তপ্রতীক, জিহাদি জজবায় প্রজ্বলিত এক অগ্নিমশাল, এক অসম অমর ইতিহাসের নাম—শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ।

বইটির পরতে পরতে ফুটে ওঠেছে—

- বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের মূল কারণ এবং এর থেকে উত্তরণ।
- কীসে উম্মাহর লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, পরাজয় এবং কীসে উম্মাহর শান্তি-নিরাপত্তা, সম্মান আর বিজয়।
- মুসলিম উম্মাহর হারানো নেতৃত্ব এবং তা পুনরুদ্ধারকরণ।
- মুনাফিক গাদ্দার আরব-শাসকসহ বিশ্বময় মুসলিম-নামধারী তাগুত মুরতাদ শাসকদের মুখোশ উন্মোচন ও এদের ঈমান ভঙের কারণ।
- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও জাতীয়তাবাদ—এই চার কুফরি-শিরকি মতবাদের ওপর নির্মিত সংবিধান পরিহারকরণ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদ, হরতাল, মিছিল-মিটিং, মানববন্ধন ইত্যাদি তাগুত-অনুমোদিত প্রতিরোধ-প্রক্রিয়া বর্জনকরণ এবং

নববি আদর্শে কুফর ও শিরক মূলোৎপাটন, শান্তির লেবাসধারী সন্ত্রাসী তাগুতগোষ্ঠীর উচ্ছেদকরণ।

- সর্বোপরি রয়েছে—মুসলিম উম্মাহর বিশ্বজয়।
- বিশ্বময় ইসলামি পুনর্জাগরণ ও 'খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ' প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও দিকনির্দেশনা।

এসবকিছুরই সমন্বয়ে রচিত আমাদের এই ***'গর্জে ওঠো হে উম্মাহ!'***

বইটির বিশেষ স্থানে যুক্ত হয়েছে নীতি-দীর্ঘ টীকা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। সবশেষে যুক্ত হয়েছে রণাঙ্গনের বিভিন্ন কমান্ডার, ওস্তাদ ও শাইখ, যেমন—

- শাইখ ডক্টর আইমান আজ-জাওয়াহিরি রাহিমাহুল্লাহ,
- শাইখ ডক্টর শহিদ আবদুল্লাহ ইউসুফ আজ্জাম রাহিমাহুল্লাহ,
- শাইখ কমান্ডার আবু মুসআব জারকাবি রাহিমাহুল্লাহ,
- শাইখ আবু মুহাম্মাদ মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ,
- শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ,
- শাইখ আমিরুল হিন্দ মাওলানা আসেম ওমর রাহিমাহুল্লাহ,

-সহ প্রমুখ শাইখদের অমূল্য বাণী, অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা।

আশা করি, বইটি রণাঙ্গনের মুজাহিদিন, তালিবানে ইলম ও ইসলামি পুনর্জাগরণ-স্বপ্নদ্রষ্টা ভাইদের গাইডলাইন হিসেবে কাজে দেবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করো, আমাদের প্রাণপ্রিয় শাইখকে কবুল করো, তাঁর রেখে যাওয়া মিশনকে পূর্ণাঙ্গ করো, তার বাহিনীকে ইমাম মাহদির অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে কবুল করো, একই স্থানে তাঁর সাথে আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করো; আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন!

আবু আসআদ
২৭.৩.২০২১ ইং.

হে মুসলিম উম্মাহ!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা সকলে তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করি, সাহায্য চাই তাঁরই কাছে, তাঁরই কাছে করি ক্ষমা প্রার্থনা। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই নফসের কুমন্ত্রণা এবং সব কুকর্ম থেকে। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, সৎপথ দেখান, কেউ নেই তাকে সৎপথ থেকে বিচ্যুত করার; আর আল্লাহ যাকে পথচ্যুত করেন সত্য পথ থেকে, কেউ নেই তাকে সত্য-সঠিক পথে ফিরে আনার। আমি সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশিদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ٩٨﴾

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং খাঁটি মুসলিম হয়েই মৃত্যুবরণ করো।’ [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯৮।]

গর্জে ওঠো-১

গর্জে ওঠো-২

গর্জে ওঠো-৩

গর্জে ওঠো-৪

গর্জে ওঠো-৫

গর্জে ওঠো-৬

গর্জে ওঠো-৭

গর্জে ওঠো-৮

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হে মুসলিম উম্মাহ!	১১
বুদ্ধিবৃত্তিক বা চিন্তাযুদ্ধের কিছু উপকরণ বা মাধ্যম	১৪
শিক্ষা-বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা	১৪
ইসলামের চিরশত্রুরা এ ক্ষেত্রে দু-পদ্ধতিতে হেঁটেছে	১৫
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	১৫
মুসতাশরিক তথা প্রাচ্যবিদদের লিখিত বই-পুস্তক প্রচার-প্রসার করা	১৬
ইসলামের বিপরীত বিভিন্ন ধর্ম, মতাদর্শ ও মতবাদের প্রচার-প্রসার করা	১৬
শান্তিরক্ষার নামে ইসলাম ধ্বংসের আয়োজন	৩৪
শান্তিরক্ষা-মিশনের মুখোশ উন্মোচন	৩৫
মুসলিমদের সাথে জাতিসংঘের প্রতারণা	৩৬
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করার বিধান	৩৭
প্রথম পয়েন্ট : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মুসলিমদের চিরশত্রু ক্রুসেডারদের ব্যাপারে মুসলিম-দেশগুলোর শাসকবৃন্দের অবস্থান	৫১
দ্বিতীয় পয়েন্ট : মুসলিমদেশ ফিলিস্তিন-প্রসঙ্গ	৫২
তৃতীয় পয়েন্ট :	৫৬
চতুর্থ পয়েন্ট : কারণ, ঈমান ভঙের দশটি কারণের অন্যতম হলো, 'মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা	৫৭
ইকরাহ তথা বাধ্য হওয়ার শর্তাবলি	৫৮
পঞ্চম পয়েন্ট :	৬০
ষষ্ঠ পয়েন্ট :	৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তম পয়েন্ট :	৬৩
আলোচিত কথার সারমর্ম	৬৪
কাফিরদের সাথে মুয়ালাত তথা বন্ধুত্ব করার বিধান	৭৩
মানব-জীবনে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকৃতিদানের প্রভাব	৮৬
আলোচিত কথার সারমর্ম	৮৯
খেলাফত বা ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কী?	৯০
মানবজাতির প্রতি শয়তানের শত্রুতা পর্যায়ক্রমে সাত স্তরে প্রকাশ লাভ	৯৫
আমরা নব্য মুরজিয়া হয়ে যাচ্ছি না তো?	৯৭
কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন	১০১
শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহর বাণী	১০১
বাস্তব পদক্ষেপ	১০১
পবিত্র রামাদানের আগমনে মোবারকবাদ	১০২
ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ	১০২
দুই প্রতিবেশীর মাঝে কত-না পার্থক্য!	১০৩
ফিলিস্তিনকে সাহায্যের শপথ	১০৩
তাগুত থেকে সম্পর্কচ্ছেদ তাওহিদের ভিত্তি	১০৪
সতর্কতা আবশ্যক	১০৪
জাহিলিয়াতের দীন	১০৫
মুরতাদ ও কাফিরের গোলাম!	১০৫
মাছের জন্যে পানি	১০৫
শাইখ আবুল হাসান আল বুলাইদি রাহিমাহুল্লাহর বাণী	১০৬
জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম!	১০৬
শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহর বাণী	১০৬
বর্তমান জিহাদে সফলতার সুসংবাদ	১০৬
শাইখ আইমান আজ-জাওয়াহিরি রাহিমাহুল্লাহর বাণী	১০৭
মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব	১০৮
দুটি বিপরীত সিদ্ধান্তের সম্মুখে	১০৮
সমাজ সংশোধনের মূলনীতি	১০৮
কর্মপরিকল্পনা!	১০৯

বিষয় পৃষ্ঠা

শাইখ আবু ফিরাস আস-সুরি রাহিমাহুল্লাহর বাণী..... ১০৯
আমেরিকাকে যেভাবে ধ্বংস করা সম্ভব..... ১০৯
শাইখ আনওয়ার আওলাকি রাহিমাহুল্লাহর বাণী.....১১০
মডারেট ইসলাম.....১১০
শাইখ ইব্রাহিম আর-রুবাইশি রাহিমাহুল্লাহর বাণী.....১১০
শত্রুতা ও ধৈর্যধারণ.....১১০
শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহর বাণী ১১১
জিহাদের প্রভাব ১১১
কখনোই সাহায্যপ্রাপ্ত হব না.....১১২
শাইখ ইউসুফ আল উওয়াইরি রাহিমাহুল্লাহর বাণী.....১১২
শারীরিক প্রস্তুতি ১১২
শাইখ আদেল আব্বাস রাহিমাহুল্লাহর বাণী ১১২
শাইখ আবু মুসআব আবদুল ওয়াদুদ হাফিজাহুল্লাহর বাণী ১১৩
কখনোই যুদ্ধ ছাড়ব না.....১১৩
শাইখ আবু ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহর বাণী.....১১৩
হয়তো জিহাদ নয়তো লাঞ্ছনা, যা ইচ্ছা বেছে নাও ১১৩
শাইখ কমান্ডার আবু মুসআব যারকাবি রাহিমাহুল্লাহর বাণী ১১৪
সাহায্য অবতরণ.....১১৪
শাইখ নসর বিন আলী আল আনাসি রাহিমাহুল্লাহর বাণী ১১৪
অবশ্যই শরিয়া প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাব.....১১৪
শাইখ আতিয়াতুল্লাহ লিবি রাহিমাহুল্লাহর বাণী ১১৫
ইসলামের লড়াইয়ের বাস্তবতা.....১১৫
শাইখ আবু সুফিয়ান আযদি রাহিমাহুল্লাহর বাণী ১১৫
শাইখ ড. শহিদ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম রাহিমাহুল্লাহর বাণী.....১১৬
শাহাদাত ১১৬
ফিলিস্তিনকে ফিরিয়ে আনা ঈমানের অংশ.....১১৬
শাইখ সুলাইমান আবুল গাইস রহিমাহুল্লাহুর বাণী ১১৭
নিশ্চয় সফলতা মুমিনদের জন্য.....১১৭
শাইখ কাসেম আর-রিমি হাফিজাহুল্লাহর বাণী.....১১৭

বিষয় পৃষ্ঠা

কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলবে ১১৭
কমান্ডার আবদুল আযিয মুকরিন রাহিমাহুল্লাহর বাণী..... ১১৮
শাইখ মুখতার আবু জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহর বাণী ১১৮
শাইখ আমির আসেম ওমর রাহিমাহুল্লাহর বাণী.....১১৯
সঠিক মানহাজেই জিহাদের সফলতা ১১৯
আকাবির কি কম বুঝতেন? ১১৯
শাইখ আবুল হাসান আল বালিইদি তাকাব্বালাহুল্লাহুর বাণী..... ১২০
আছে কি কেউ সাড়া দেবে জিহাদের পথে, জান্নাতের পথে? ১২০
শাইখ ফারেস আজ জাহরান রাহিমাহুল্লাহর বাণী..... ১২০

হামদ ও সালাতের পর—

[মুসলিম উম্মাহর মহান শাইখ, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী, কমান্ডার বীর মুজাহিদ] উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেনের পক্ষ থেকে সকল মুসলিম ভাই-বোনের প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।

'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গোটা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কাফিরদের সব ষড়যন্ত্র ও কূটচাল নস্যাৎকরণার্থে, উম্মাহকে 'জিহাদের' প্রতি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আমার এই ছোট্ট পুস্তিকা। কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও কুপরিকল্পনার কিছু চিত্র তো পূর্বেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, দারুল খিলাফাহ বাগদাদে[১] রাসায়নিক অস্ত্র[২] থাকার মিথ্যা অজুহাতে দেশীয় মুসলিম-নামধারী

১. দারুল খিলাফাহ বাগদাদকে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর রাহিমাহুল্লাহ ১৪৬ হিজরিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। হাফিজ ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বাগদাদ' একটি অনারবি শব্দ। কেউ বলেছেন, বাগদাদ শব্দটি "بغ" ও "داد"-এর সমন্বয়ে গঠিত। 'বাগ' অর্থ বাগান আর 'দাদ'-এর অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে কয়েকটি মতামত রয়েছে। কেউ বলেছেন, এটা কোনো ব্যক্তির নাম। আর কেউ বলেছেন, এটা একটি মূর্তির নাম। আবার কেউ বলেছেন, এটা একটা শয়তানের নাম। এ কারণে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আল্লামা আসমায়ি এবং আরো অন্যান্যরা 'বাগদাদ' শব্দটি উচ্চারণ করতে অপছন্দ করতেন। তাই তাকে 'মাদিনাতুস সালাম' নামে ডাকা হতো। আর এ শহরটির প্রতিষ্ঠাতা নিজেই তার জন্য এ নাম নির্ধারণ করেছেন। কারণ, দাজলা নদীকে 'ওদিউস সালাম' বলে ডাকা হতো। *[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/১০১।]*

২. মার্কিন নির্বাচনে ডেমক্রেট দলের প্রার্থী জনকেরি ইরাক-যুদ্ধের প্রথম বার্ষিকী স্মরণীয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, 'বুশ তার প্রদত্ত ভাষণে আমেরিকান জনগণকে ধোঁকা দিয়েছে; ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের কাছে পারমাণবিক ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র থাকার বিষয়টি নিয়ে। সে আমেরিকানদের সাথে ইরাক-যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো কথা ব্যক্ত করে নি। অপর দিকে আমেরিকান জনগণ তাদের অঢেল সম্পদ ইরাক-যুদ্ধের জন্য ব্যয় করেছে। সূত্র : *''তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ''* এর

মুরতাদদের সহযোগিতায় ক্রুসেডাররা বাগদাদ জবরদখল করে নেয়। এমনিভাবে বিশ্ব-মানবতার দুশমন কুখ্যাত জায়নবাদী সন্ত্রাসী ইহুদিরা 'খারিতাতুত তারিক'[৩] ও জেনেভা[৪] শান্তি-চুক্তির ধোঁকা ও ছত্রছায়ায়

টীকা। [*''তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ''* শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহি.-এর একটি কিতাব। এ কিতাবটি তিন খণ্ডে বিভক্ত।]

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের একটি বক্তব্য ইরাক-যুদ্ধের মৌলিক কারণ কী ছিল তা নিয়ে ব্রিটেনের এক পত্রিকা ১৪২৫ হিজরিতে একটি লেখা প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, 'বুশ ও ব্লেয়ার ভালো করেই জানত যে, ইরাকে ধ্বংসাত্মক রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যাপারে তারা যা বলেছে, তা ছিল সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ একটি বিষয়। ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকান বাহিনীর যুদ্ধটা ছিল লন্ডন ও ওয়াশিংটনের কিছু মিথ্যা-বানোয়াট ও ভুল ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে। *''তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ''*-এর টীকা।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক টেলিভিশন সি.এন.এনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ব্লেয়ার বলেন, 'যে-গোয়েন্দাতথ্য আমরা পেয়েছিলাম, তা ভুল ছিল। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। আর এ সংবাদটি সি.এন.এন রোববার সম্প্রচার করে। প্রথম আলো, শিরোনাম : ইরাক-যুদ্ধে 'ভুলের' জন্য ব্লেয়ারের দুঃখ প্রকাশ।

'প্রথম আলোতে' আরো বলা হয়েছে, সাদ্দাম সরকারের কাছে গণবিধ্বংসী মারাত্মক অস্ত্র ছিল, এমন অভিযোগের ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সরকার ইরাকে হামলা চালানোর ঘটনাটিকে ন্যায়সঙ্গত করতে চেয়েছিল; কিন্তু যে-গোয়েন্দাতথ্যের ভিত্তিতে ওই সামরিক অভিযান চালানো হয়, সেটা পরবর্তী সময়ে ভুল প্রমাণিত হয়।

৩. 'খারিতাতুত তারিক' বলা হয়, চারটি সংঘের উদ্যোগে মধ্যপ্রাচ্য তথা ফিলিস্তিন-সমস্যা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে যে সম্মেলন সংঘটিত হয়েছিল। চারটি সংঘ আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, রাশিয়া ও জাতিসংঘ।

কয়েকটি সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

এক. সহিংস ও উগ্র-আন্দোলন বন্ধের নামে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বরকতময় আন্দোলন ও প্রতিরোধকে বন্ধ করে দেয়া। ফিলিস্তিনের সর্বক্ষেত্রে তথা অর্থনৈতিক, প্রতিষ্ঠান, নিরাপত্তা ও আইনগত বিভিন্নক্ষেত্রে কাঠামোগত আমূলসংস্কার বা প্রগতিবাদমূলক কাজ করা; কুখ্যাত ইহুদিজাতিকে ফিলিস্তিনের শহরসমূহ থেকে বহিষ্কার করার পরিবর্তে।

দুই. কোনো একটা অঞ্চলভিত্তিক সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমানায় ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া।

তিন. ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সারবস্তুর পরিমাণ তুলে না ধরা। সূত্র : *''তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ''*-এর টীকা।

মুসলিমদের প্রথম কিবলা আল-মাসজিদুল আকসাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া; সেই সাথে চালিয়ে যাচ্ছে প্রিয় ফিলিস্তিনের জিহাদ ও মুজাহিদিনকে নিঃশেষ করার ভয়ংকর সব ষড়যন্ত্র। সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর ওপর চলছে—ক্রুসেডিয় মিডিয়ার[৫] ঘৃণ্য আক্রমণ। আর এসব ক্রুসেডিয় মিডিয়া

৪. মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেনেভায় সোমবার সন্ধ্যায় ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের চারশত ব্যক্তি এবং সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত আরো কয়েকশত ব্যক্তিদের উদ্যোগে যে সম্মেলন সংঘটিত হয়েছিল, তাকে 'মুবাদারাতু জানিফ লিস সালাম' বলা হয়।

এই সম্মেলনে যে চুক্তি সংঘটিত হয়েছিল তা অসলে শান্তিচুক্তি নামে প্রসিদ্ধ। এ শান্তিচুক্তির পর নোবেল-পুরস্কার পেয়েছিলেন ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইতজাক রাবিন এবং পি.এল.ও-নেতা ইয়াসির আরাফাত।

এ চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ফিলিস্তিনিরা স্বশাসনের আংশিক অধিকার পাবে এবং ইজরাইল প্রথমে পশ্চিম তীরের জেরিকো এবং তারপর গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। এর বদলে ইজরাইলি রাষ্ট্রের বৈধতা স্বীকার করে নেবে পি.এল.ও। *[বি বি সি নিউজ, বাংলা; ১৫ মে ২০১৮।]*

৫. ঈমান ও কুফরের লড়াই চিরন্তন। শুরু হয়েছে পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে, যা আজবধি বাকি আছে। তবে পরিবর্তনের ছোঁয়া পেয়েছে যুদ্ধ-লড়াইয়ের ধরণ ও আকৃতিতে। এক সময় পক্ষ-বিপক্ষের যুদ্ধ হতো শুধু বাহ্যিক আসবাবপত্র এবং বস্তুগত জিনিস দ্বারা। যেমন : তীর, ধনুক, তলোয়ার, বর্শা, অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ও গোলাবারুদ ইত্যাদি; কিন্তু এখন আর যুদ্ধের ধরণ ও প্রকৃতি আগের মতো নেই। যুদ্ধের কৌশল ও ধরণের সাথে নতুনমাত্রায় যুক্ত হয়েছে, যুদ্ধের অভিনব ভয়ংকর কৌশল। সেই অভিনব ভয়ংকর যুদ্ধ কৌশল হলো, মুসলিমদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড বা চিন্তাযুদ্ধ। এ যুদ্ধের লক্ষ্য হয়ে থাকে, শত্রুপক্ষের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আঘাত করা। এ যুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের আক্রমণের চেয়ে বহুগুণ ভয়ংকর। বাহ্যিক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে কোনো মুসলিম-দেশে অভিযান পরিচালনা করলে মুসলিমরা কাফিরদেরকে শত্রু মনে করে এবং সাধ্যে যতটুকু আছে, তা দ্বারা কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অকাতরে বিলিয়ে দেয় নিজেদের সবকিছুই। অপর দিকে মুসলিমদের টার্গেট করে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড বা চিন্তাযুদ্ধের মিশন পরিচালনার কারণে মুসলিমরা কাফিরদেরকে শত্রুই মনে করে না; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো দূরের কথা! যারা কাফিরদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের কাছে মাথানত করে পরাজিত হয়, তাদের অনেকেই কাফিরদেরকে বন্ধু মনে করে এবং তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কোনো মুসলিম যদি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের শিকার হয়, এবং কাফিরদের হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে তো সে মুরতাদ হয়ই, এমনকি যে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের শিকার হয়ে

এমন আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে কিংবা এমন কথা বা কর্ম করে যা ঈমান ভেঙে দেয়, তাহলেও সে মুরতাদ হয়ে যাবে। এজন্য চিন্তাযুদ্ধের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয়, কাফিরদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড বা চিন্তাযুদ্ধ কী কিংবা তার ধরণ ও প্রকৃতি কী, তাও আজকের মুসলিমরা জানে না। যার ফলে অনায়েসেই মুসলিমরা নিজেদের অগোচরে চিন্তাযুদ্ধের মায়াজালে ফেঁসে যাচ্ছে। এই হলো বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড-যুদ্ধ বাহ্যিক বস্তুগত যুদ্ধের থেকে ভয়ংকর হওয়ার কারণ।

বুদ্ধিবৃত্তিক বা চিন্তাযুদ্ধের কিছু উপকরণ বা মাধ্যম

১. **মিডিয়া বা প্রচারমাধ্যম।** আর এর রয়েছে বহু শাখাপ্রশাখা। এ সংক্রান্ত লিখিত বইপত্র, উপন্যাস, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ও মাগ্যাজিন, সিনেমা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি।

সচেতন পাঠক! মিডিয়াশক্তির যে কী প্রভাব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মিডিয়া মুহূর্তের মধ্যে যে-কোনো অবস্থা ও প্রেক্ষাপটকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। মিডিয়ার সর্বাধিক দক্ষতা ও অবদান হলো, মিডিয়া যদি চায় কোনো সত্যকে মিথ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আর কোনো মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে, তাহলে এ-কাজ তার জন্য একেবারেই সহজ একটি বিষয়। শুধু সময়ের ব্যাপারমাত্র। সে এ কাজ শতভাগ সফলতার সাথে যুগ যুগ ধরে খুবই নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে! মিডিয়ার জন্য এ কাজ সহজ হবেই-বা না কেন? আমরা যে মিডিয়ার অনুগত গোলাম! যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে নিই! কখনো কি একটু চিন্তা করেছি, বিশ্বব্যাপী মিডিয়াশক্তি কারা নিয়ন্ত্রণ করছে? যারা সংবাদগুলো প্রচার করে, তারা কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে এবং কোন ধরনের চিন্তা-চেতনা লালন করে? সংবাদগুলোর উৎস কী? প্রথমে সংবাদগুলো কাদের থেকে গ্রহণ করা হয়? মনে রাখবেন, আমরা যত সংবাদই শুনি তার সিংহভাগই ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের থেকেই প্রথমে গ্রহণ করা হয় এবং পরে তা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। শত্রুরা ভালো করেই জানে, মিডিয়ার কী প্রভাব, মিডিয়ার কী ক্ষমতা? এজন্যই তো এগুলোর নিয়ন্ত্রণ তাদেরই হাতে। তারা যেভাবে চায় সেভাবেই সংবাদপ্রচারকরা সংবাদ প্রচার করে থাকে। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু। এজন্যই তো মিডিয়ার সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে ইসলাম ও মুসলিম-বিদ্বেষ। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন সাইট নিয়ে সংশয় ও ধুম্রজাল সৃষ্টি করা এবং মুসলিমদের সন্তানদেরকে কাফির-মুরতাদ বানানোর ক্ষেত্রে মিডিয়া বিরাট বড় অবদান রেখে যাচ্ছে! হে মুসলিম ভায়েরা! ইসলামের সঠিক শিক্ষা জানুন এবং জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তা কার্যকর করার চেষ্টা করুন। আর মিডিয়ার গোলামি থেকে বেরিয়ে আসুন।

২. শিক্ষা-বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা।

শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা জ্ঞানের মূল্যায়ন এভাবে করা হয় যে, শিক্ষা হলো দু-ধারী অস্ত্র। এ মূল্যায়নে তাড়িত হয়ে ইসলামের চিরশত্রু সকল কাফিররা বুঝতে পেরেছে যে,

মুসলিমদের মাঝে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের যে দৃঢ়তা রয়েছে, তা কখনো শক্তি ও অস্ত্র দ্বারা নিঃশেষ করা যাবে না। কারণ ইসলামি আকিদাই তাদেরকে অনেক রক্তাক্ত করেছে। তারা আল্লাহর রাস্তার সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদদের স্লোগান ও ধ্বনির সামনে দাঁড়াতে পারে নি, টিকে থাকতে পারে নি। এজন্য তারা বিকল্প পথের পথিক হয়েছে। সেই বিকল্প পথটি অত্যন্ত ভয়ংকর। আর তা হলো, ইসলামি বিশ্বের শিক্ষা-দীক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা নিজেদের আবিষ্কৃত চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, সংশয় ও সন্দেহ প্রয়োগ করে; আর এগুলোকে বলা হবে নিরেট ইলমি গবেষণা মাত্র, এছাড়া অন্য কিছু নয়!

ইসলামের চিরশত্রুরা এ ক্ষেত্রে দু-পদ্ধতিতে হেঁটেছে—

১. মুসলিম-বিশ্বের দেশীয় কিংবা ভিতরগত শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

২. মুসলিম সন্তানদেরকে কাফিরদের দেশে শিক্ষা-দীক্ষার উদ্দেশে প্রেরণ করার মাধ্যমে।

সচেতন পাঠক! বর্তমানে সারা পৃথিবীর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের শত্রুরাই। কতক জায়গায় তো সরাসরি আর কতক জায়গায় তাদের আদর্শে দীক্ষিত লোক দ্বারা। পৃথিবীর বড় বড় নামকরা ইসলামি ইউনিভার্সিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামি ইনস্টিটিউট, মাদরাসা সরাসরি তাদের বা তাদের দীক্ষিত লোকদের নিয়ন্ত্রণে। এমনকি এক সময় যে কওমি মাদরাসার শিক্ষা ছিল সব ধরনের ষড়যন্ত্র ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত, তাতেও শত্রুদের আগ্রাসন ও নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পাঁয়তারা শুরু হয়ে গেছে এবং অনেকটা পথ পাড়িও দিয়েছে।

সচেতন পাঠক! জ্ঞানার্জন করা অবশ্যই ভালো কাজ। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি, টেকনোলজি, স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান এবং বিজ্ঞান শেখার অনুমতি আছে, নিজের মহামূল্যবান সম্পদ দীন ও ঈমানকে রক্ষা করার শর্তে। দেশে হোক বা বিদেশে, এমন কোনো জ্ঞান শেখা, যা দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয় বা ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তো ইসলাম এ ধরনের জ্ঞান শেখার অনুমতি দেয় না। দর্শনশাস্ত্র, এটা পুরোটাই কাফিরদের নিয়ন্ত্রণে এবং তা অনেক নাস্তিক দার্শনিকদের এমন এমন দর্শন দ্বারা ভরপুর, যা যদি কোনো মুসলিম-ঘরের সন্তান মেনে নেয় বা বিশ্বাস করে, তাহলে তার ঈমান চলে যাবে। বলাবাহুল্য যে, অনেক দার্শনিক আছে, যাদের এমন কতক দর্শন রয়েছে, যা পুরো কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধি। আর সেসমস্ত দর্শনই অনেকটা দর্শনশাস্ত্রে স্থান পেয়েছে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার এক ভাই, তার সাথে মাঝপথে সাক্ষাৎ। আমি তাকে বললাম, কী নিয়ে পড়াশুনা করছেন? সে প্রতিউত্তরে বলল, বাবা-মায়ের বড় ইচ্ছা, আমি দর্শনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করব। সে আবার বলল, ভাই! দর্শনশাস্ত্র সারা বছর আমি খানিকটা

সময়ও পড়ি না। শুধু পরীক্ষার আগ-মুহূর্তে একটু পড়ি। পরীক্ষার হলরুমে যাওয়ার পথে আসতাগফিরুল্লাহ পড়তে পড়তে যাই; আবার হল থেকে বের হওয়ার পথে আসতাগফিরুল্লাহ পড়তে পড়তে বের হয়ে আসি। ভাই! ব্যাপারটা তো বুঝতে পারলাম না। তিনি বললেন, দর্শনশাস্ত্রে এমন অনেক দর্শন রয়েছে, যার কোনো একটি কেউ বিশ্বাস করলে বা মেনে নিলে, তার ঈমানই থাকবে না।

৩. **মুসতাশরিক তথা প্রাচ্যবিদদের লিখিত বই-পুস্তক প্রচার-প্রসার করা।**

মুসতাশরিক হলো, ওই সকল পশ্চিমা পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী, যারা নিজেদের ধর্মীয় উগ্রতার শিকার হয়ে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো, এর দ্বারা ইসলাম এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুসলিমদের মাঝে সংশয় ও সন্দেহের বীজ বপন করা এবং বিশেষ করে মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা নষ্ট করা, ধ্বংস করা।

এমন কোনো মুসলিম-দেশ নেই যেখানে মুসতাশরিকদের পদচারণা নেই। মুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষা, আকিদা-বিশ্বাস, ধর্ম সবকিছুতেই তাদের সন্দেহ ও সংশয়ের কালো থাবা পড়েছে। আরব-দেশগুলোতে তাদের আনাগোনা অনেকটাই বেশি। সেখানের ইসলামি ধারার প্রতিষ্ঠানগুলোর সিংহভাগই তাদের দিকনির্দেশনা ও ক্যাটাগরিতে চলে। শিক্ষাসচিবের পদগুলো তাদেরই করতলে। আরব-বিশ্বে তারা বিভিন্ন লোভনীয় ও আকর্ষণীয় নামে 'আরবি পত্রিকা' বের করে থাকে। আরব-বিশ্বে প্রসিদ্ধতম পত্রিকা 'আশ্‌শারকুল আওসাত ও আল আলামুল ইসলামি' তারাই প্রকাশ করে থাকে। আমার যেটা মনে হয়, আরব-বিশ্বের গুটি কয়েকটি পত্রিকা বাদ দিয়ে প্রায় সব পত্র-পত্রিকা ও মাগ্যাজিন তারাই নিয়ন্ত্রণ করে।

বি.দ্র. র‍্যান্ড কর্পোরেশন সংস্থাটি সারা পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে এবং মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাসকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য মিশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের মুসলিমদের প্রধান শত্রু আমেরিকা ও ইজরাইলসহ সকল কুফরি শক্তির দার্শনিক ও চিন্তানৈতিক অন্যতম উৎস ও চালিকাশক্তি হলো, অসংখ্য মুসতাশরিকদের সমন্বয়ে গঠিত র‍্যান্ড কর্পোরেশন।

৪. **ইসলামের বিপরীত বিভিন্ন ধর্ম, মতাদর্শ ও মতবাদের প্রচার-প্রসার করা।**

বর্তমানে মুসলিমজাতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক কুপরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রসমূহের অন্যতম একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হলো মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন কুফরি ধর্ম, মতবাদ ও মতাদর্শ ছড়িয়ে দেয়া। তারা এ ধরনের ধর্ম, মতাদর্শ ও মতবাদ মুসলিমদেরকে গিলানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে, মুসলিমরাও তাদের সেই ধর্ম, মতাদর্শ ও মতবাদ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সেগুলোকে নিজেদের জীবনের সংবিধানও বানিয়ে নিয়েছে। আর কুরআন ও সুন্নাহর আইনকে মধ্যযুগীয় কিংবা সেকেলে বা বর্বর অথবা যুগের সাথে তালমিলিয়ে চলতে না পারার অভিযোগে অভিযুক্ত করে, তাকে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা থেকে অপসারণ করেছে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। সে আলোচনা থেকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে যে, র‍্যান্ড কর্পোরেশন সংস্থাটি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর চরম শত্রু। এখন র‍্যান্ড কর্পোরেশনের একটি মূল্যায়ন উল্লেখ করব। কারণ শত্রু সম্পর্কে শত্রুর মূল্যায়ন বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ হয়। এজন্য সচেতন মানুষমাত্রই শত্রুর মূল্যায়ন থেকে নিজের পাথেয় সংগ্রহ করে এবং করণীয় নির্ণয় করে। আশা করি, তা আমাদের গন্তব্য স্থির করতে সাহায্য করবে এবং আমরা আল্লাহর কাছে কোনো প্রকার মুসলিম হিসেবে দণ্ডায়মান হতে চাই।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের মতে মুসলিমরা চার প্রকার—

১. **ফান্ডামেন্টালিস্ট/মৌলবাদি :** এরা ধর্মকে শুধু বিশ্বাস এবং গুটি কয়েক ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বমহলে পূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠা করতে চায়; অর্থাৎ যারা পৃথিবীতে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠা করতে চায়। র‍্যান্ডের দাবি, এরা হলো পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের নম্বর ওয়ান ও প্রধান শত্রু। এদের যে-কোনো মূল্যে শেষ করতে হবে। এরাই হলো, পশ্চিমা সংস্কৃতি, পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

২. **ট্র্যাডিশনালিস্ট :** এরা মুসলিমদের মধ্যে নরমাল হুজুর-শ্রেণি। এ জাতীয় মুসলিমদের গণ্ডি মসজিদ, মাদরাসা, শেখা-শেখানো, ফাতওয়া, মাসআলা ও খুতবা দেয়া, এসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে তাদের নিজস্ব অন্য কোনো কার্যক্রম নেই। র‍্যান্ড বলেছে, এরা পশ্চিমা সভ্যতার জন্য মৌলিকভাবে হুমকি নয়। কিন্তু সাবধান! যদি কখনো এরা ফান্ডামেন্টালিস্ট তথা যারা পৃথিবীতে ইসলামি শরি'আহ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে বিশাল ঝামেলা। কারণ ট্র্যাডিশনালিস্টদের সাধারণ মানুষের ওপর বিশাল প্রভাব রয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো এদের জন্য সহজ। প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের উদ্দেশে এসে তাদের ওয়াজ-নাসিহাত খুব গুরুত্বসহকারে শ্রবণ করে থাকে। ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান বা জনসমাবেশ করতেও কিন্তু মেলা ঝুঁকি। জায়গা ঠিক করো, পোস্টার ছাপাও, এই করো, সেই করো। অথচ মুসলিমরা নিজ থেকেই প্রতি শুক্রবার গোসল করে, আতর মেখে, সুন্দর করে সেজে, ভালো কাপড় পরিধান করে, এদের কাছে চলে আসে। তাই এরা যদি মৌলবাদিদের সাথে একত্রিত হয়, তাহলে সেটা অনেক বড় বিপদ। এ কারণে এ দু'শ্রেণিকে পরস্পর থেকে দূরে রাখতে হবে। আর যারা ট্র্যাডিশনালিস্ট হুজুর তাদেরকে নিজেদের মধ্যে মাসলাক-মাজহাব-ফিকহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ইখতিলাফ ও তর্কে ব্যস্ত রাখতে হবে। তারা যেন নিজেদের মধ্যেই তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত থাকে, সে-ব্যবস্থা খুব সূক্ষ্মভাবে করতে হবে।

সচেতন পাঠক! ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু র‍্যান্ড কর্পোরেশনের পাতানো ফাঁদে আমরা তো শতভাগ ফেঁসে গেছি। যেখানে ক্রুসেডার ও জায়নিস্ট এবং তাদের মিত্রশক্তির কালো থাবায় মুসলিম উম্মাহর রক্ত রঞ্জিত, মুসলিমদের ভূখণ্ডগুলোকে

প্রতিনিয়তই জবরদখল করে নিচ্ছে। মুসলিমদের ওপর প্রাত্যহিক চালানো হচ্ছে, নির্যাতন-নিপীড়নের স্টিমরোলার। নিজ নিজ ভিটা-বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে, বহিষ্কৃত হয়ে যাযাবরের ন্যায় জীবন যাপিত করছে। পৃথিবীর কোনো মুসলিমরাষ্ট্রে ইসলামি শরিয়ার বাস্তবায়ন নেই। বাস্তবায়ন আছে, কুরআন ও সুন্নাহ-বিরোধি মানবরচিত কুফরি আইনের। আর এই কুফরি আইনের নির্যাতন ও নিপীড়নের যাতাকলে পিষ্ট মুসলিম উম্মাহ; আর সেখানে আমরা ইখতিলাফি বিভিন্ন মাসআসা নিয়ে ব্যস্ত! নিজেদের মধ্যে করছি কাদা ছুড়াছুড়ি। ফিকহের বিভিন্ন মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার আলোচনায় আমরা তৃপ্তিলাভ করি। আর আমরা আমাদের বড় শত্রু ও প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলেছি আমাদের মতো অন্যান্য মুসলিম ভাইদেরকেই। কুরআনে বর্ণিত যারা আমাদের চরম শত্রু তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের মহান দায়িত্ব পালন করা তো দূরের কথা, আমরা তাদেরকে কেমন যেন শত্রুই মনে করছি না, কিংবা যদিও শত্রু মনে করে থাকি, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেয়া আমাদের ওপর ফরজ ছিল, তা কি আমরা করছি?

৩. **মডারেট মুসলিম :** এরা হলো, ওইসব লোক যারা ইসলামের এবং ইসলামের বিভিন্ন বিধানের নতুন নতুন ব্যাখ্যা করতে চায়। আর এসব ব্যাখ্যার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থা, পশ্চিমা সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা; পশ্চিমা সভ্যতার ছাঁচে ইসলামকে সাজানো। যাতে তাদের সভ্যতা ও অস্তিত্বের জন্য ইসলাম ও মুসলিমরা হুমকিরূপে না থাকে। নীতি-নির্ধারনের ক্ষেত্রে র‍্যান্ডের সাজেশান তথা পরামর্শ হলো, এই মর্ডানিস্ট মুসলিমদের সাহায্য করতে হবে। এদের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। আর বিশেষভাবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এদের প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ সাধারণ মুসলিমদের কাছে এদের তেমন কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই মিডিয়ার মাধ্যমে এদেরকে বেশি বেশি মানুষের সামনে নিয়ে আসতে হবে। যাতে তাদের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

৪. **সেকুলারিস্ট :** এরা প্রথম থেকেই পশ্চিমাদের পকেটে আছে। পশ্চিমা শিক্ষা এরা আত্মস্থ করে ফেলেছে; হজম করে নিয়েছে। এরা মনস্থির করে ফেলেছে, শাসনের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম হলো ধর্ম; আর ধর্ম হলো বিশ্বাস, ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি। এরা তো ওদেরই লোক।

ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সভ্যতা জেতার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি র‍্যান্ড কর্পোরেশনের নির্দেশনা হলো, মর্ডানিস্ট আর সেকুলারিস্ট এ দুশ্রেণিকে সব ধরনের সহযোগিতা করো। মৌলবাদি তথা ফান্ডামেন্টালিস্ট দলটি তথা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর সৈনিক মুজাহিদদেরকে শক্তভাবে দমন করো। এদের থেকে ট্র্যাডিশনালিস্টদেরকে দূরে রাখো; এবং তাদেরকে ব্যস্ত রাখো নিজেদের মধ্যকার ইখতিলাফ ও মতপার্থক্যে। এই হলো মুসলিমদের ওপর বিজয় হওয়ার একমাত্র পলিসি।

বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ, বিশেষত হারামাইনের মুসলিমদের[৬] বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র এঁটেছে, তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে; প্রকাশ পেয়েছে—মুসলিম

উল্লেখ্য, বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্নভাবে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের কার্যক্রম দিন দিন বেড়েই চলছে। অনেক মুসলিমই এখন র‍্যান্ড কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত। এমনকি কওমি ঘরানার অনেক আলিম নামের কলঙ্ক তাদের থেকে রীতিমতো কোর্স করে শিক্ষা ও আদর্শের দীক্ষা নিচ্ছে। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম!

সচেতন পাঠক! কাফিররা যে মুসলিম ব্যক্তি বা দলের প্রতি যে-পরিমাণ সন্তুষ্ট, যে-পরিমাণ তাদেরকে নিজেদের জন্য হুমকি স্বরূপ মনে করে না, সে ব্যক্তি বা মুসলিমদল ইসলাম থেকে তত বেশি দূরে। ইসলামের সাথে সে-ব্যক্তি বা দলের সম্পর্ক বেশি একটা ভালো নয়। আর কাফিররা যাদের প্রতি একেবারেই সন্তুষ্ট; তাহলে সেসব ব্যক্তিরা কীভাবে মুসলিম থাকতে পারে? আর যাদেরকে কাফিররা নিজেদের শাসনব্যবস্থা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য চরম শত্রু মনে করে, তারাই পৃথিবীতে সর্বাধিক খাঁটি মুসলিম, তারাই সর্বাধিক শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র শুধু তারাই। তারাই জান্নাতের হুর-গিলমানদের সর্বাধিক ভালোবাসে আর জান্নাতের হুর-গিলমানরাও তাদেরকেই সর্বাধিক ভালোবাসে।

সম্মানিত পাঠক! আমরা যদি গভীরভাবে আল্লাহর একটি আয়াত লক্ষ করি, তাহলে পূর্বে বর্ণিত কথাগুলো বুঝতে ও মেনে নিতে আমাদের অনেকটাই সহজ হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে নবি! আপনার প্রতি ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনো সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ১২০।] হায়, আফসোস! আমরা কোন ধরনের মুসলিম হলাম যে, শত্রুরা আমাদেরকে মৌলিকভাবে শত্রুই মনে করে না, নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে না! অথচ কুরআন ও সুন্নাহর বহু প্রামাণ্যে এ কথা সাব্যস্ত যে, কাফিররা মুসলিমদের চরম ও চিরশত্রু। তাহলে এর অর্থ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, আমরা কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষা থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি। শরিয়ত আমাদের ওপর যেসব দায়িত্ব অর্পিত করেছে, আমরা সেগুলো পালন করছি না। আল্লাহ আমাদের ওপর যেসব কাজ ফরজ হিসেবে ধার্য করেছেন, তা আদায় না করে আমরা মনচাহি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। মনে রাখা জরুরি যে, আমরা যদি বাস্তবিক অর্থেই কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে ধারণ করতাম, তাহলে অবশ্যই শত্রুরা আমাদেরকে মৌলিকভাবেই শত্রু মনে করত, যেমনটা কুরআনে আল্লাহ বলেছেন।

সচেতন পাঠক! উপরের আলোচনা থেকে আমাদের গন্তব্য স্থির করার গাইডলাইন ও রোল মডেল চলে এসেছে। তাই কোনটা গ্রহণ করবেন, আপনিই ভাবুন। কোনটা আপনার জন্য জান্নাতের রাস্তা মসৃণ করবে, আখিরাতে আপনার জন্য কল্যাণকর হবে, সেটাই গ্রহণ করুন।

৬. ক্রুসেডারদের মোড়ল আমেরিকা বিশ্বের সমগ্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশেষত আরব-রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র ও নীল নকশা এঁটেছে তা বাস্তবতার মুখ দেখতে

উম্মাহর চরিত্র, মানহাজ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আকিদা পাল্টে দেয়ার লক্ষ্যে ক্রুসেড-মোড়ল মার্কিনদের যাবতীয় নীল নকশা, পদক্ষেপ-পদচারণা। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা তাদের যুদ্ধকে মূল্যায়ন করেছে স্পষ্ট ভাষায়—'মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমাদের এ যুদ্ধ ধর্মীয়[৭] রাজনৈতিক যুদ্ধ।' তারা চায়—মুসলিম

শুরু করেছে। আরবীয় সংস্থাগুলো তাদের নেতা ও গুরুজি আমেরিকার অর্ডার অক্ষরে অক্ষরে পালনের মাধ্যমে আপন প্রভুর ডাকে সাড়া দিতে শুরু করেছে। আরব-বিশ্বের সরকারি পত্রিকাগুলো ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ প্রচার করেছে। যেমন : অচিরেই মুসলিম-দেশ ইরাক তাদের শিক্ষাব্যবস্থার মানহাজ বা পদ্ধতি পরিবর্তন করার ব্যাপারে পূর্ণবিবেচনা করবে। এমনিভাবে জর্দান, কুয়েত ইত্যাদি বিভিন্ন মুসলিম-রাষ্ট্র এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নীতি অবলম্বন করেছে। আরব-উপসাগরীয় শীর্ষ রাষ্ট্রগুলো পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসবাদ (জিহাদ ও মুজাহিদ) নিঃশেষ করার এবং শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করার ব্যাপারে জোড় দেয়া শুরু করেছে। সূত্র : '*তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ*'-এর টীকা।

৭. মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় যুদ্ধকে বলা হয় ক্রুসেড-যুদ্ধ। ক্রুসেড-যুদ্ধের সূচনা হাজার বছরের আগ থেকেই। বহু শতাব্দি পেরিয়ে গেছে এ যুদ্ধকাল। তবে সেই ক্রুসেড-যুদ্ধ এখনো বলবৎ এই পৃথিবীতে। এই যুদ্ধ কিয়ামত অবধি চলতে থাকবে সম্মুখপানে। এখানে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের কয়েকজন লিডারের উক্তি তুলে ধরাটা যুক্তিসঙ্গত মনে করছি, যাতে আমরা তাদের উক্তিগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি।

খ্রিষ্টান ক্রুসেডার নবম লুইস (স্পেনের বাদশাহ) বলেছে, সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে মুসলিমজাতিকে পরাজিত করা অসম্ভব; বরং তাদের আকিদা-বিশ্বাসকে ধ্বংস করার জন্যও আগ্রাসন চালানো আবশ্যক। [*আল-ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৩৯৬।]

খ্রিষ্টান ক্রুসেডার উইলিয়াম গিফফোর্ড ক্রড বলেছে, যখন কুরআন ও মক্কা-শহর আরবদেশ থেকে হারিয়ে যাবে, তখনই আমাদের জন্য দেখা সম্ভব হবে যে, মুহাম্মাদ এবং তাঁর কিতাব আরবজাতিকে যে সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, সে সভ্যতাকেই আরবজাতি পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করতে থাকবে। [*আল গারারা আলাল আলামিল ইসলামি*, পৃষ্ঠা : ৯৪; দ্বিতীয় সংস্করণ।]

বিশ্ব-আইম্মাতুল কুফর খ্রিষ্টান ক্রুসেডার বুশ বলেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধগুলো ক্রুসেড-যুদ্ধ। সে আরো বলেছে, 'আমাদের যুদ্ধ চলবে দীর্ঘ দিন যাবৎ। আর আমাদের যুদ্ধের লক্ষ্য ষাটটি দেশ'। পাঠক! ইসলামি বিশ্ব কি ষাটটি দেশের সমষ্টি নয়?

জায়নিস্ট ইহুদিরা সারা পৃথিবীর কলকব্জাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও সমগ্র মানবজাতির ওপর দাদাগিরি করার বাসনায় অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে চব্বিশটি মূলনীতি প্রণয়ন

করেছে; কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত, রাশিয়ার একটি পত্রিকা ১৯০১ সালে তাদের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছে। তাদের এ ভয়ংকর পরিকল্পনার সময়কাল যদি পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার সময় থেকে গণনা করা হয়, তখন এর সময় হয় ১২০ বছর। আল্লাহ ভালো জানেন, তারা এ পরিকল্পনা কত আগেই-না করেছে! চব্বিশটি মূলনীতির একটি মূলনীতি এখন উল্লেখ করছি—

তেরোতম মূলনীতি হলো, 'আমাদের যে-কোনো নতুন পরিকল্পনা অ-ইহুদিদের (ইহুদি ছাড়া যারা আছে) সামনে প্রকাশ পাওয়া থেকে দূরে রাখার জন্য আমরা অচিরেই তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের খেলা-ধুলা ও ক্রিয়া-কৌতুকের মাধ্যমে উদাসীন করে রাখব। অচিরেই আমরা পত্র-পত্রিকায় অ-ইহুদিদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পিত ম্যাচ বা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার আহ্বান করা শুরু করব। যেমন : শিল্প, ব্যায়াম এবং আরো যা কিছু রয়েছে। ইহুদি ও অ-ইহুদিজাতির মাঝে মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়সমূহ থেকে এই নতুন বিনোদন অ-ইহুদিজাতির চিন্তা-চেতনাকে আবশ্যকীয়ভাবে উদাসীন করে রাখবে। পর্যায়ক্রমে যখন অ-ইহুদিজাতিবর্গ স্বতন্ত্র চিন্তাশক্তির নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে, তখন সকলেই আমাদের সাথে একই বিন্দুতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার স্লোগান তুলবে। আর সেই বিন্দুটি হলো, আমরা অচিরেই যারা চিন্তা ও পরিকল্পনার নতুন রূপরেখা পেশ করার যোগ্য সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে অভিন্ন সমাজের সদস্য হব'।

সচেতন পাঠক! উপরের উক্তিগুলোতে একটু গভীরভাবে লক্ষ করুন, কাফিরদের লিডাররা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কত আগ থেকেই কী ধরনের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ছক এঁকে গেছে। ইসলামের শত্রুদের বড় একটি টার্গেট হলো, মুসলিম উম্মাহর আকিদা-বিশ্বাস। তারা ছলে-বলে-কৌশলে এবং বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের আশ্রয়ে মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাসকে নস্যাৎ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের এ নড়েবড়ে দুর্বল আকিদা-বিশ্বাস, মুসলিম উম্মাহর করুণ পরিস্থিতির অন্যতম কারণও বটে।

দ্বিতীয় ক্রুসেডারের উক্তি 'কুরআন ও মক্কা-শহর যখন হারিয়ে যাবে'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য, যখন কুরআনের শিক্ষা এবং মক্কা-শহরের মৌলিক শিক্ষা হারিয়ে যাবে, তখন আরবজাতি পশ্চিমাদের সভ্যতাকে গ্রহণ করে নেবে। বর্তমানে আমরা গোটা আরববিশ্বেই সেই ক্রুসেডারের উক্তির বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। কুরআন ও মক্কা-শহর তো আছে; কিন্তু কুরআন ও মক্কার মৌলিক শিক্ষা ও তার বাস্তবায়ন নেই। যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ জিহাদ ও আকিদা-বিশ্বাসের ঝাণ্ডা নিয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হতো, তাহলে এ সকল মানবতার দুশমন নরপিশাচ, মুসলিমদের সামনে নত হয়ে, করুনা-ভিক্ষা করে বসবাস করতে হতো। কাফিরদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতি গ্রহণ করা তো দূরের কথা, তারাই উল্টো ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিতো।

তৃতীয় ক্রুসেডার তো ঘোষণা করেছে, মুসলিমদের ও আমাদের মাঝের চলমান লড়াই-যুদ্ধ ধর্মীয় ক্রুসেড-যুদ্ধ। আর অপর দিকে আমরা তো ঘোষণা করেছি, নফসের বিরুদ্ধে ক্রুসেড-যুদ্ধ!

উম্মাহকে গোলাম বানিয়ে রাখতে, তাদের ভূমি-সম্পত্তি জবরদখল করতে আর আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিমরা মানবরচিত কুফরি গণতন্ত্র ও তাদের আরো বিভিন্ন মতাদর্শ-মতবাদ ও সাংস্কৃতিকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছে[৮]। সুতরাং যদি মুসলিমরা এখনই এগুলো প্রত্যাখ্যান না করে এবং

জায়নিস্ট ইহুদিদের প্রণীত তেরতম মূলনীতি তো, মুসলিমদের জীবনের জ্বলন্ত ও চরম বাস্তবতা। আমরা তাদের সেই পাতানো ফাঁদে পা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছি। বলাবাহুল্য যে, যখন কোনো ব্যক্তি অবসর থাকে, কোনো কাজে ব্যস্ত না থাকে, তাহলে সে যে-কোনো একটা কাজে জড়িয়েই যায় এবং তার সাথে নিজের সম্পর্ক আপন করে নেয়। সেজন্য নরপিশাচ জায়নিস্টরা অ-ইহুদি সম্প্রদায়কে বিশেষ করে মুসলিমদেরকে, তন্মধ্যে হতে তরুণ মুসলিম যুবকদেরকে, বিভিন্ন ধরনের খেলা-ধুলা ও ক্রিয়া-কৌতুকে ব্যস্ত রেখে, পৃথিবীব্যাপী নিজেদের ষড়যন্ত্র ও কুপরিকল্পনার মায়াজাল বাস্তবায়নকরণার্থে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক প্লান হাতে নিয়েছে। তারা অনবরত ষড়যন্ত্র করেই যাচ্ছে আর আমরাও প্রতিনিয়ত তাদের নব-উদ্ভাবিত বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে ফেঁসে যাচ্ছি। আপনিই বলুন, ফুটবল, ক্রিকেট, গেমস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের খেলা, কাকে আকৃষ্ট করে নি! স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, মাদরাসার ছাত্ররা, এক কথায় সব শ্রেণির মানুষেরই এগুলোর প্রতি অগাধ আকর্ষণ ও ভালোবাসা রয়েছে। তাছাড়া জায়নিস্টদের এবং পরে আরো যারা এ কাজে ইন্ধন জুগিয়েছে তাদের এ ধরনের খেলা-ধুলার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদেরকে বিশেষ করে মুসলিম তরুণ শার্দুলদেরকে ইসলামের সুউচ্চ চূড়া এবং মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র সোপান 'জিহাদ' থেকে বিরত রাখা।

কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমরা তো ফেঁসে গেছি, তাহলে আমরা কীভাবে তাদের এ ধরনের ভয়ংকর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হব? এ ধরনের প্রশ্ন আসাটা খুবই স্বাভাবিক। বাঁচার উপায় হলো, প্রথমত আমাদের মনোবল বাড়াতে হবে; চাঙ্গা করতে হবে। নিজেদেরকে মনে করতে হবে আমরাই বিজয়ী জাতি। তারপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে। কাফিরদের ষড়যন্ত্রগুলো খুবই সূক্ষ্ম। তাদের ষড়যন্ত্রগুলো প্রথমে আমাদের জানতে হবে এবং তা জানার ক্ষেত্রে আমার উত্তম সহপাঠী হতে পারে এ সংক্রান্ত বই পড়া কিংবা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায়। জেনে সেগুলো থেকে শতভাগ বেঁচে থাকার চেষ্টা করা এবং বাস্তবিক অর্থে সততার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর পথে অবিরাম চলতে থাকা। নিজের ঈমান ও আমলকে হিফাজত করার লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যারা হকদল তাদের অনুসরণ করা।

৮. ১৯২৪ সালের আগ-পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ খেলাফত ও ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ছায়াতলে ছিল। তারা কুরআন ও সুন্নাহকেই একমাত্র নিজেদের সংবিধান ও রোল-মডেল মনে

করত। কুরআন ও সুন্নাহকেই উন্নয়ন ও উন্নতির মাপকাঠি মনে করত। কিন্তু ১৯২৪ সালে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের হাতে যখন খেলাফতে উসমানিয়া ধ্বংস হয়ে গেল, তখন থেকেই তারা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। নেতৃত্বের বাগডোর চলে গেল ইসলাম ও মুসলিমজাতির চিরশত্রু কাফির-বেঈমানদের নিয়ন্ত্রণে। তারা ইসলামি বিশ্বের ওপর উড়ে এসে জুড়ে বসল—নেতৃত্বহীন মুসলিমজাতির অভিভাবকরূপে। তারা মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দিল তাদেরই আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ ও মতাদর্শ। আর মুসলিমরাও তা গ্রহণ করে নিল। একটু লক্ষ করুন, যখন থেকে মুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহকে ছুঁড়ে ফেলে মানবরচিত বিভিন্ন ধর্ম যেমন : গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি নিজেদের সংবিধানরূপে গ্রহণ করে নিল, তখন থেকেই তাদের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার সূচনাবিন্দু। গুটি কয়েকটি স্থান ছাড়া সর্বত্রই চলছে মানবরচিত ধর্মের বাস্তবায়ন। আর এসব ধর্মগুলোকেই মুসলিমজাতি নিজেদের উন্নয়ন ও উন্নতি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক মনে করছে। বর্তমানে মুসলিমরা কাফিরদের বানানো সিস্টেমের ভেতরে ঢুকে দীর্ঘদিন যাবৎ খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা! অনেক আলিম-ওলামা ও ইসলামি স্কলারও এসব মানবরচিত কুফরি ধর্মের দিকে প্রতিনিয়ত দৌড়-ঝাঁপ করছে—ইসলামি খেলাফতব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে। তারা এ পথে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু সে-পথ আর শেষ হয় নি। আমি নিশ্চিত যে, তারা যে-লক্ষ্যে কাফিরদের বানানো পথে হাটছে, সে-পথ আর শেষ হবে না। মানবরচিত নির্বাচনী পন্থায় যেভাবে ইতিপূর্বে কখনো কোনো দল ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, এখনো পারছে না আর ভবিষ্যতেও পারবে না। আর যদি কখনো কাফিরদের চোখ ফাকি দিয়ে হঠাৎ মসনদে বসেই যায়, তাহলে ইসলামি হুদুদ ও কিসাস বাস্তবায়নের পূর্বেই মসনদ থেকে নেমে যেতে হবে, নেমে যেতে বাধ্য। খেলাফত বা ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ নববি পদ্ধতির দাওয়াত ও জিহাদ। এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। এজন্য যদি বাস্তবিক অর্থেই আপনারা খেলাফত কায়েম করতে চান, তাহলে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবাদের আমলি জিন্দেগি ও ইসলামি সোনালি ইতিহাস-সমর্থিত নববি দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতির আলোকে অগ্রসর হোন। পূর্বে বলা হয়েছে, গুটি কয়েকটি স্থানে কুরআন ও সুন্নাহর আইন চলে। যিনা করলে অবিবাহিত হলে, একশত বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়া। ইরতিদাদ প্রমাণিত হলে, তার শাস্তি তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা তথা শিরশ্ছেদ করা। এভাবে ইসলামি সব বিধিবিধান পূর্ণ ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে এবং কোনো ধরনের ছাড় দেয়া ছাড়াই কার্যকর করা হয়। সে স্থানগুলোর অন্যতম আফগানিস্তান ও সোমালিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। আর সরাসরি জিহাদের সশস্ত্র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কাশ্মির, সোমালিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, মৌরিতানিয়া, ওয়েস্ট সাহারা, আলজেরিয়া, মালি, বুর্কিনা-ফাসো, নাইজার, চাঁদ, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, জাজিরাতুল আরব ইত্যাদি অঞ্চলগুলোতে। এছাড়াও অঘোষিতভাবে আরো অনেক দেশেই

বাস্তবসম্মত প্রতিরোধ গড়ে না তোলে, তাহলে মুসলিম উম্মাহর জন্য অপেক্ষা করছে আরো তিক্ত ও কঠিন পরিণতি। মুসলিমদেশ ইরাক দখল করাটা ছিল ক্রুসেডার ও জায়নবাদীদের কুপরিকল্পনারই একটি অংশ। অতঃপর হাতের মুঠোয় এসে যাবে অবশিষ্ট উপসাগরীয় দেশগুলো পূর্ণ দখলদারির সুযোগ, অনন্তর এটাই হবে পুরো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা ও নিজেদের ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সূচনা। উপসাগরীয় এলাকা ও দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণই পুরো পৃথিবী নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি। কারণ, এতে রয়েছে—আন্তর্জাতিক পেট্রোল-ভাণ্ডার। আর ইরাক দখল ছিল আমেরিকার এক পূর্ব কুপরিকল্পনা। সুতরাং ইরাক শত্রুদের টার্গেটে যেরূপ ছিল অতীতে, আছে এখনো, সেরূপ থাকবে ভবিষ্যতেও।

ভাবার বিষয় হলো, তাদের বিপরীতে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু[৯]? বর্তমানে এই ক্রুসেডিয় ও জায়নিস্টদের হামলা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে আরো

প্রাথমিক কার্যক্রম তথা জিহাদের প্রস্তুতিপর্ব চলছে। আমাদের বাংলাদেশও এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। *অনুবাদক*

৯. কাফির-বেঈমানরা ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু। পৃথিবীব্যাপী যত কাফির আছে তথা ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, কমিউনিস্ট, নাস্তিক, মুরতাদ ও যিন্দিক, এরা সকলেই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক কাতারে, একই পরিবারভুক্ত। যদিও এদের পরস্পরের মাঝে আমরা কখনো কখনো দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য দেখতে পাই। যেমন চীন ও ভারতের মাঝে বিরোধ, আমেরিকার সাথে চীন বা রাশিয়ার দ্বন্দ্ব এবং এছাড়া আরো যত বিরোধ ও দ্বন্দ্ব রয়েছে তাদের পরস্পরের মাঝে, এসবই তাদের রাজনৈতিক সমস্যা, পারস্পারিক স্বার্থের আঘাত এবং বাণিজিক যুদ্ধ-বিবেচনায়। আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলে জান নি, 'সকল কাফির একই জাতি, একই পরিবারভুক্ত'। এ হাদিসের সারনির্যাস তো এটাই যে, তারা সকলে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক কাতারে থেকেই যুদ্ধ করবে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা করবে। একে অপরের কাছে ভালোবাসার বার্তা পাঠাবে। আর আমরা এই সন্ধিক্ষণে এ হাদিসের বাস্তবতা সূর্যালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করছি। এই তো বেশি দিনের আগের কথা নয়, মায়ানমারের মুসলিমদের সাথে ঘটিত ঘটনাপ্রবাহের দিকে একটু গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন, তাহলে সবই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মায়ানমারের মুসলিমদের গণহারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে মায়ানমারের সামরিক জান্তারা, চীনের সমর্থন ও সহযোগিতায়। আর এই মায়ানমারের সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনীকে ইসলামের চরম ও জঘন্যতম দুশমন সন্ত্রাসী ইহুদিরা প্রশিক্ষণ দিয়েছে মুসলিমদের গণহারে নিধনের লক্ষ্যে। আর মায়ানমারের মুসলিমদের নৃশংসভাবে হত্যা করার এবং এই মানবতা-বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে

ভয়ানক অশুভ পরিস্থিতি তৈরি করবে। তাদের এসব হামলা মুসলিম উম্মাহর দীনি ও দুনিয়াবি উভয় দিক বিবেচনায় শঙ্কা ও অপরিণামদর্শিতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব-আইম্মাতুল কুফর [কুফরনেতা] খ্রিষ্টান ক্রুসেডার বুশ কি বলে নি, 'ইসলামের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধগুলো 'ক্রুসেড-যুদ্ধ'[১০]।' সে কি আরো বলে

তথাকথিত মানবতার ধ্বজাধারীরা ও জাতিসংঘ এবং আরো যারা আছে, তারা শুধু মৌখিক নিন্দার ঝড় তুলেই ক্ষান্ত। তাদের দৌড়-ঝাঁপ এতটুকুই। এটাও তাদের একটি কৌশল ও প্রতারণা। অনেক মুসলিমতো মনে করেছে যে, জাতিসংঘ মায়ানমারে মুসলিম হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে সরব! সে তা সমর্থন করে না! বলাবাহুল্য যে, অন্তড়ালে বাস্তবে জাতিসংঘও এ জঘন্য কার্মের সমর্থনকারী। জাতিসংঘ এ নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে মৌখিক নিন্দা করা ছাড়া অন্য কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। এক পর্যায়ে যখন মায়ানমারের মুসলিমরা পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে নিজেদের হাজারো বছরের বাস্তু-ভিটা থেকে উৎখাত ও নির্বাসিত হয়ে আশ্রয় নিল, তখনই জাতিসংঘ ত্রাণকর্তা ও মহান দয়াবানের ছদ্মবেশে মুসলিমদের ঈমান হরণ করে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য চলে গেল রোহিঙ্গা মুসলিমদের শরণার্থীশিবিরে। তারা খ্রিষ্টান এন জি ও দেরকে লেলিয়ে দিল এই ন্যাক্কারজনক জঘন্যতম কাজে। তারা সেখানে বিনামূল্যে বাসস্থান, খাবার, চিকিৎসা ও শিক্ষা ইত্যাদি সব-ধরনের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ছলে-বলে-কৌশলে অসহায় ও সাদাসিদে মুসলিমদের ঈমান ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে দীক্ষিত করছে খ্রিষ্টান ধর্মে। এটা কি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের এক কাতারবদ্ধ হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়? কাফিররা প্রতিনিয়তই প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের গো-পূজারি হিন্দু মালাউনরা উপমহাদেশের মুসলিমদের হত্যার ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতি সকলেই প্রস্তুত হচ্ছে। তারা প্রাত্যহিক তাদের অস্ত্রকে শানিত করছে। তারা রাসুলের ভবিষ্যদবাণী গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা তাদের টার্গেট নিয়ে সম্মুখপানে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন ভাবার বিষয় হলো, আমরা কি প্রস্তুতি নিচ্ছি? আমরা কি আমাদের আকাশে উদিত সেই কালো ঝড়ের ঘনঘটার মোকাবিলা করতে পারবো? সেজন্য এখন থেকেই টার্গেট নিয়ে প্রস্তুতি নিই। নিজের, নিজের পরিবার-পরিজনের এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঈমান, আমল, শান্তি, নিরাপত্তা এক কথায় সর্বপ্রকার কল্যাণ অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি। এজন্য কোনো হকপন্থি মুজাহিদ-দলের সদস্য হয়ে যাই। শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতকে নিজের আবাসস্থান বানিয়ে নিই। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন। *অনুবাদক*

১০. এ কথাটি আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিল। এ সংবাদ সম্মেলনটি ১৪২২ হিজরির জুমাদাস সানি মাসের আটাশ তারিখ মোতাবেক ২০০১ ইংরেজি সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল। আমেরিকান কয়েকজন বিজ্ঞজন তার এ কথার ব্যাপারে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বুশ 'সালিবিয়্যাহ'

নি, 'দীর্ঘদিন যাবৎ চলবে আমাদের এ যুদ্ধ। আর আমাদের যুদ্ধের লক্ষ্যে রয়েছে ৬০টি দেশ[১১]।' ইসলামি বিশ্ব কি ৬০টি দেশের সমষ্টি নয়? তোমাদের কি তারপরও হুঁশ ফিরবে না? তারা কি বলে নি, 'যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ায় আমরা তাদের ভৌগোলিক অবস্থা মুছে দেব।'

শত্রুদের প্রথম টার্গেট—ইসলাম ও ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদ[১২]। আর তারা ভালো করেই জানে, বিশ্বে মুজাহিদবাহিনীর বর্তমানে তারা

শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। কারণ, ক্রুসেডাররা বাস্তবেই সেই ক্রুসেড-যুদ্ধগুলোর সময় সালাহউদ্দিন আইউবির হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছিল। সুতরাং আমাদের যুদ্ধগুলো পরাজয়মূলক শব্দের সাথে সম্পৃক্ত করাটা কখনো সঙ্গত নয়। সূত্র : আমেরিকান চ্যানেল *আই বি সি*। তারপরও বুশ আবারও 'হরবুন সালিবিয়্যাতুন তথা ক্রুসেড-যুদ্ধ' বাক্যটি কিন্দি সৈন্যদের লক্ষ্য করে এভাবে বলেছে যে- 'তোমরা আমাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ক্রুসেড-যুদ্ধে সঙ্গ দাও'। এমনকি আমেরিকান তথ্য-বিষয়ক একজন কর্মকর্তা বলেছে, 'মনে হয় প্রেসিডেন্ট বুশ এ বিশ্বাস রাখে যে, সে ক্রুসেড হামলার নেতৃত্ব দিচ্ছে। কারণ, কয়েক দিন পূর্বে সে এ বাক্যটি ব্যবহার করেছিল আর এ কারণে তাকে এ কথা বলা থেকে সতর্ক করা হয়েছে!! সূত্র : '*তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ*'-এর টীকা।

১১. আমেরিকান নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে, 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ষাটটি দেশে বিদ্যমান। আল-কায়েদা ষাটটি দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। অচিরেই আমেরিকা এ দেশগুলোতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিদেরকে দমন করবে।

জর্জ বুশ যখন আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসন চালায় তখন সে আমেরিকান জনগণদেরকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেছিল, 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের এ যুদ্ধ অনেক দীর্ঘ। এটা শুধু আফগানিস্তানের মাটিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এ যুদ্ধ ওইসব দেশেও বিস্তার লাভ করবে, যে-দেশগুলো সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তাদেরকে আশ্রয় দেবে। '*তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ*'-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

১২. আমাদের শত্রুদের সর্বপ্রথম টার্গেট হলো, ইসলামের শীর্ষচূড়া জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। কারণ, এ জিহাদই তাদের মাথা ব্যথার মৌলিক কারণ। এজন্য তারা জিহাদের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছে। জিহাদকে নিঃশেষ করা বা দমিয়ে রাখার জন্য এমন কোনো পথ নেই যে পথে তা পা বাড়ায় নি। দরবারি মুফতি ও আলিমদের মাধ্যমে তারা জিহাদের বিকৃতি সাধনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। আর এর জন্য তারা খরচ করেছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। কিন্তু জিহাদের সেই লেলিহান শিখা কি নির্বাপিত হয়েছে? জিহাদের অগ্নিশিখা কি নিভে গেছে? না নিভে যায় নি, বরং পৃথিবীর আরো দিগদিগন্তে ছড়িয়ে গেছে জিহাদের এই অগ্নিশিখা। যে জিহাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র গুটি কয়েকটি স্থানে, সে জিহাদ আজ প্রায় প্রতিটি মহাদেশেই বিদ্যমান। আল্লাহ যে আলো তার

মুসলিমদের ভূখণ্ড ও সম্পদ দখল করে কখনো শান্তি পাবে না। 'সুতরাং তোমরা এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।'

ওহে মুসলিমজাতি! বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার এ বিষয়ের বক্তব্যও বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের দীন ও দুনিয়া হিফাজতের অধিক আগ্রহী[১৩]। কীভাবেই-বা এটা হবে না? তোমরা যে আমার

সৈনিকদের মাধ্যমে জ্বালিয়েছেন, সে আলো কার সাধ্যে আছে নিভিয়ে দেয়ার? বলাবাহুল্য যে, কাফিররা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী। সারা পৃথিবীব্যাপী ফিতনা ও ফাসাদ তারাই ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারাই মুসলিমদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করছে এবং মুসলিম ভূখণ্ডগুলো দখল করে নিয়েছে। মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর ওপর তারাই জেঁকে বসেছে। সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক মুসলিমজাতিই নির্যাতিত ও নিপীড়িত। সর্বত্রই শুনা যায় তাদেরই কান্না। তাদেরই কান্না ভেসে আসে কর্ণকুহরে। আর এই নির্যাতন ও নিপীড়নের সমাপ্তির একমাত্র পথ 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'। এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। এজন্য সারা পৃথিবীতেই মুসলিম উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আল্লাহর একদল সৈনিক কাফিরদের মোকাবিলায় সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে গেছে। সর্বত্রই তারা কাফিরদের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। জিহাদ এমন এক শক্তি, যার মোকাবিলা করার সামর্থ্য দুনিয়ার কারো নেই; নেই দুনিয়ার কোনো তথাকথিত সুপার পাওয়ারেরও। বর্তমানে সারা বিশ্বেই মুজাহিদরা এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। যার বাস্তবতা আমরা রিবাতের ভূমিগুলোতে, জিহাদের ভূমিগুলোতে প্রত্যক্ষ করছি। কোথায় জাতিসংঘ আর ন্যাটোবাহিনী? তাদের দম্ভ আর অহংকার কোথায় গেল? তারা না সুপার পাওয়ারের অধিকারী! সর্বাধিক মারাত্মক মারণাস্ত্র না তাদেরই করতলে। বুশ না বলেছিল, মাত্র এক সপ্তাহে আফগানিস্তানকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। ১৯ বছর তো বিগত হয়ে গেল, এখনো তো সেই রিবাতের ভূমি দাঁড়িয়ে আছে আপন মহিমায়। কাফিরদের বিশ্বাসতো বিজয় আসে বাহ্যিক অস্ত্রশস্ত্র ও শক্তি-সামর্থ্যে। আর আল্লাহর সৈনিকদের বিশ্বাসতো এক আল্লাহর ওপর। বাহ্যিক কোনো শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নয়। কুরআনে তো স্বয়ং আল্লাহই বলেছেন, 'সাহায্য ও বিজয় তো আসে আল্লাহর পক্ষ থেকেই।' **শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহি.** বলেছেন, আমাদের এখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা দরকার। কাফিররা যে বিষয়কে প্রধান টার্গেট বানিয়েছে সে বিষয় নিয়েই আমাদের সামনে অগ্রসর হওয়া দরকার। এর মাধ্যমেই কাফিরদের দম্ভ ও অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে। সুতরাং আমরা যদি বাস্তবিক অর্থেই মুসলিমদের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে জিহাদি অপারেশন পরিচালনা করতে হবে। তাদের অন্যায়ের পাওনা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। *অনুবাদক*

১৩. শাইখ মুসলিম উম্মাহকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমি তোমাদের কল্যাণকামী। আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ

কামনা করি। এজন্যই তোমাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর কথাগুলো এই পুস্তিকায় তুলে ধরেছি। বর্তমানে মুসলিমদের মৌলিক কাজ কোনটা হওয়া দরকার, কোন কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে, সে কথা আমি এখানে তুলে ধরেছি। মুসলিম উম্মাহ কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলে দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ইসলামি শাসনব্যবস্থার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে, সে পদ্ধতির কথা আমি এই পুস্তিকায় প্রমাণাদি ও বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপন করেছি। আমি তোমাদেরকে জিহাদের পথে এবং মুজাহিদদের দলের সদস্য হওয়ার আহ্বান করছি। এটাই তোমাদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর। এ পথে ইখলাসের সাথে অগ্রসর হতে পারলে, বিনা হিসাবে তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। আমি তোমাদেরকে যে পথের দিকে আহ্বান করছি, এটা আমার এবং সকল মুসলিমের জন্যই বিস্ময়জনক কল্যাণকর একটি বিষয়। এ কথার ব্যাপারে আমি শতভাগ সত্যবাদি। কেনই-বা আমি সত্যবাদি হব না! আপনারা জানেন, আমি ছিলাম অঢেল ধন-সম্পদের মালিক। আমার বাপ-দাদাদের ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের কোনো অভাব ছিল না। আমার কোনো কিছুর কমতি ছিল না। যা খুশি তা-ই করতে পারতাম। অঢেল ধন-সম্পদ ফূর্তি ও আনন্দ-উল্লাসে ব্যয় করতে পারতাম। এক কথায় দুনিয়ার সকল আনন্দ ও বিনোদনে বিভোর হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করি নি। আমি বেছে নিয়েছি দুনিয়ার সর্বাধিক ভয়ংকর দুর্গম গিরিপথ। আমি আমার আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেছি পাহাড়ের গুহা এবং বন-জঙ্গল। আর আমি এসব কিছুই নিজের ভাগ্যে বরণ করে নিয়েছি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণার্থে, মুসলিমদেরকে কাফিরদের গোলামি থেকে বের করে মহান প্রতিপালকের গোলামির দিকে নিয়ে আসতে, মুসলিমজাতিকে কাফির-বেঈমানদের নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্য এবং তাদেরকে ইসলামি শাসনব্যবস্থার ছায়াতলে শান্তি ও নিরাপত্তা-ঘেরা এক অনন্য জীবনের দিকে নিয়ে আসতে। একটি প্রশ্ন, এমন কোন্ পাগল আছে, যে দুনিয়ার সুখময় জীবন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে পাহাড়ের গিরিপথে, গুহায় ও বন-জঙ্গলে নিজের আশ্রয়স্থল বানাবে? এ পথে সে ব্যক্তিই পা বাড়াবে, যে দুনিয়ার জীবনের ওপর আখিরাতের জীবনকে প্রধান্য দেয়, যার হৃদয় প্রতিটি মুহূর্তে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত থাকে এবং যে চায় মুসলিমদেরকে কাফিরদের নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত করতে। আর আমাদের মহান শাইখ এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই ভয়ানক পথে পা বাড়িয়েছেন আল্লাহর ওপর ভরসা করেই। শাইখের কুরবানি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে আজ সারা পৃথিবীতে ঘুণেধরা মুসলিমজাতি আবার জাগ্রত হয়েছে। হাতে নিয়েছে জিহাদের পতাকা। সর্বত্রই জিহাদের আওয়াজের ঝনঝনানি। সকল কাফির ভয়ে প্রকম্পিত, তাদের প্রাণগুলো প্রায় ওষ্ঠাগত। সেদিন বেশি দিন দূরে নয়, যেদিন বিশ্বের মানুষ এই আধুনিক ডিজিটাল যুগে দেখতে পাবে—অতীতে হারিয়ে যাওয়া সেই সোনালি ইতিহাসের বাস্তবচিত্র। *অনুবাদক*

দীনি ভাই আর আমরা যে সকলেই একই বাবা-মার সন্তান। আর রাহবার তো সাথিদের সাথে কখনো মিথ্যে বলতে পারে না। তোমরা এ জরুরি বার্তা ধারণ করার নিমিত্তে আপন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি আমার বক্তব্যের প্রতি নিবদ্ধ করো। 'কীভাবে মুসলিমজাতি এ লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতি থেকে বেরোবে?' আমি এ বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলব, যেমনটা আল্লাহর নবী শুয়াইব আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে বলেছিলেন—

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾﴾

'আমি যথাসাধ্য তোমাদের সংশোধনই কামনা করি আর আল্লাহ তাআলাই একমাত্র তাওফিক দাতা। আমি তাঁর ওপর ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে ধাবিত হই।' [সূরা হুদ, আয়াত : ৮৮।]

আমি আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বলছি, আল্লাহর জন্যই আমি কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করি না। আমি এ ধরনের কার্যক্রম (জিহাদি কার্যক্রম) পরিচালনা করছি—স্রষ্টার সন্তুষ্টি কামনায় এবং সত্যকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করার লক্ষ্যে; যদিও অসন্তুষ্ট হয় স্রষ্টার সৃষ্টি।

আমাদের জীবনপ্রদীপ শেষ হয়ে যাবে একদিন; আর আমাদের রিজিক তো আসমানে, তাহলে কেন আমরা সত্য বলা এবং সত্যের সাহায্য করা থেকে কাপুরুষতা দেখাব? যারা আল্লাহর সাথে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত, মহা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, নের্বোধ-নিকৃষ্ট, একমাত্র তারাই সত্যের পক্ষাবলম্বন এবং তার সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়; অথচ তার ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে।

এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হলো, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। আমরা সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা করছি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারি—আল্লাহর কুরআন ও রাসুলের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই। সুতরাং জরুরি হলো, মুসলিম উম্মাহর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং এ বিচ্যুতির স্বয়ংক্রিয় শক্তি কী—তা নিয়ে আলোচনা করা। মুসলিম

উম্মাহকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করায় যাদের ভূমিকা রয়েছে, তাদের অন্যতম হলো দেশের শাসকশ্রেণি[১৪], ওলামায়ে সু (মন্দ আলিম), নিকৃষ্ট বক্তা[১৫], মুসলিম-দেশগুলোর নেতা ও শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তি (যারা জালিম

---

১৪. শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম বুখারি রাহি. তার সহিহ বুখারিতে বর্ণনা করেছেন, 'হিমস থেকে একজন মহিলা এসে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করল, আল্লাহ তাআলা জাহিলিয়াতের পর যে ইসলাম নিয়ে এসেছেন তার ওপর আমাদের মধ্য হতে কারা অটল-অবিচল থাকবে? তিনি বললেন, 'তোমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দ যতক্ষণ পর্যন্ত এ ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সেই মহিলা বলল, আইম্মা কারা? তিনি বললেন, তোমার সম্প্রদায়ে কি এমন কোনো নেতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নেই যারা তোমাদেরকে আদেশ করে আর তোমরা তা পালন করো? মহিলা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এরাই হলো তোমাদের আইম্মা তথা শাসক ও নেতা।

শাসক, নেতা ও আমির-উমারার সঠিক পথে অবিচল থাকাটা কীভাবে বুঝা যাবে? শাসক ও নেতাদের সঠিক পথে থাকাটা প্রতীয়মান হবে শাসক ও নেতা কর্তৃক ইসলামের বিষয়সমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে এবং জনগণের মাঝে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়তাকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে। আর শাসকদের ফাসাদ ও খারাবি প্রমাণিত হয়, নিজেরা আল্লাহর দীনকে ছেড়ে দেয়া এবং মানুষের মাঝে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ শরিয়াকে বাস্তবায়ন না করার মাধ্যমে।

হাফিজ ইবনু হাজর আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'কেননা মানুষতো তাদের রাজা-বাদশাহদের ধর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে'। '*তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ*'-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫. শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহি. বলেন, 'নামধারী মুসলিম শাসকরা আমাদের মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখছে আর অপর দিকে নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করছে! আর তাদের এ ধোঁকায় নতুনমাত্রায় যোগ হয়েছে নতুন আবিষ্কৃত অভিনব পদ্ধতি। সেটা হলো, স্থানীয় আলিম-ওলামা, খতিব ও বক্তাদের হাত করেছে, বাগে এনেছে। এদেরকে টেলিভিশন, রেডিও এবং মিডিয়ার বিভিন্ন প্রজেক্টে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে এবং এরা ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফাতওয়া প্রদান করছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার উদ্দেশ্য নিছক মুসলিম ও দীনের খেদমত বা সেবা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, যদি ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ ও খেদমত করার ইচ্ছা থাকত, তাহলে তারা এ ধরনের চাটুকার, লোভী ও সত্য থেকে বিমুখ ব্যক্তিদের সাহায্যে দীনি কাজ পরিচালনা করাতেন না; বরং আল্লাহভীরু, ইসলাম ও মুসলিমজাতির শুধু কল্যাণই কামনা করে, ইসলাম ও মুসলিমজাতির ব্যথায় ব্যাথিত থাকে, সত্য প্রকাশে নির্ভীক এবং বাতিলের

কাফির ও তাগুতগোষ্ঠীর প্রতি আস্থাশীল[১৬]), দেশীয় মিডিয়াকর্মী এবং যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে[১৭]। রূঢ় বাস্তবতা হলো, দেশের শাসকশ্রেণিই অধিকাংশ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দায়ি।

সাথে আপোষহীন শ্রদ্ধেয় আলিম-ওলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে এ মহা গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনা করাতেন। চাটুকার ও লোভী ব্যক্তিরা শরিয়তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক মাসআলা জনগণকে না জানানোর কারণে এবং বিভিন্ন ধরনের ভুল ও কুরআন-হাদিসকে বিকৃত করে মনগড়া বিভিন্ন বিষয় শিখানোর কারণে আজ যখন জনসাধারণকে কুরআন-হাদিসের সঠিক কথাগুলো বলা হয়, তখন তারা তা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে; এবং সহজে তারা সঠিক কথা গ্রহণ করে নেয় না। এ সবই চাটুকার ও লোভী আলিম-ওলামা, খতিম ও বক্তাদের পরিশ্রমের ফসল। *'তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ'*-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬. বাস্তবতা হলো, এ শ্রেণির ব্যক্তিরা সর্বাধিক ভয়ংকর। এরা ইসলাম ও মুসলিমজাতির জন্য বেশি ক্ষতিকারক। কারণ, এরা সত্য-মিথ্যাকে সংমিশ্রণ করে দেয়। সঠিক পথ কোনটা আর ভ্রান্ত পথ কোনটা সেটা বুঝতে দেয় না। শাইখ আইমান আজ-জাওয়াহিরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমরা পরস্পর একদিন একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলাম, জিহাদকে নিঃশেষ করার জন্য বেতনভুক্ত ও ভারাটে সাংবাদিক হয়ে মিসর এবং অন্যান্য মুসলিম-রাষ্ট্রে কাফির শাসকদের সাহায্য করাটা কি বেশি ভয়ানক ও ক্ষতিকারক নাকি মিসরের 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন'রা যে কাফির ও তাগুত শাসকদের সাহায্য করছে সেটা বেশি ভয়ানক? কোনো সন্দেহ নেই যে, জিহাদকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ইখওয়ানের কার্যক্রম অনেক ভয়ানক। কারণ, তারা মুসলিমদেরকে আল্লাহর রাস্তা, জিহাদের রাস্তা থেকে বাধা প্রদান করে—আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার নামে। এজন্য দুর্বল ঈমানদার ও দীন সম্পর্কে কম জানে এমন ব্যক্তিরা তাদের দাওয়াতে ধোঁকা খায়। হে আমার মুসলিম ভাই! তুমি কি প্রত্যক্ষ করো না যে, যখন তাগুত শাসক মুজাহিদদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা করল তখন তারা 'ইখওয়ান'দের মন্ত্রিত্বের পদ অর্পণ করল। যাতে তারা ইসলামের নামে মুসলিমদের মাঝে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতে পারে এবং ইসলামের নামে জিহাদকে মিটিয়ে দিতে পারে! (প্রিয় ভায়েরা! একটু গভীরভাবে লক্ষ করুন, সারা বিশ্বে ইসলামিক যত দল আছে, যারা ইসলামের নামে কাজ করছে (জিহাদি দল, আল-কায়েদা ও তালেবান ছাড়া) তাদের কর্মপদ্ধতি ও আচরণ নীতিমালার দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, এদের দ্বারা কাফির ও তাগুতরা অনেক লাভবান হচ্ছে।) *'তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ'*-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭. মুমিন মুসলিমদের শত্রু দু-ধরনের। একটি অভ্যন্তরীণ শত্রু, যাকে আমরা সচক্ষে দেখতে পাই না। যেমন : শয়তান ও নফসে আম্মারা। অপরটি হলো, প্রকাশ্যে যা দেখা যায়। প্রকাশ্য শত্রু অনেক ধরনের হতে পারে। এগুলোর অন্যতম হলো, যারা দীন-ইসলামের লেবাস ধারণ করে ও ছদ্মবেশে চাতুরতা ও কৌশলের আশ্রয়ে

কুরআন ও সুন্নাহর দিকনির্দেশনা হলো, হক-বাতিল তথা সত্য-মিথ্যার মাঝে বিভাজন-ব্যবধান থাকবেই; যাতে মানুষের কাছে সত্য-মিথ্যা সংমিশ্রণ না হয়ে যায়। যদি এমনটা হয়, তাহলে তো তারা সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন—

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন কর না।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ৪২।]

মুসলিমদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো থেকে দূরে রাখে কিংবা মৌলিক বিষয়গুলোকে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করে বা মূল বিষয়ের আলোচনা না করে অন্যান্য দিক নিয়ে খুব গুরুত্বসহকারে আলোচনা করে। দরবারি মোল্লারা বা ওলামায়ে সু-এরা জিহাদ ও জিহাদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিকৃতি সাধনের ব্যাপারে কী পরিমাণ যে ধুম্রজাল ও সংশয় সৃষ্টি করেছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না! তাদের মাথা ব্যথা জিহাদ নিয়ে! জিহাদ থেকে মুসলিমদেরকে বিরত রাখার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করেছে তারা। আর আমরা যারা দেওবন্দি দাবিদার, হকের দাবিদার তারাও কিন্তু এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। আমাদের দেশে অনেক পীর সাহেব আছেন, আমিরুল মুজাহিদিন আছেন এবং অনেক বড় বড় আলিম-ওলামাও আছেন, তারা মুসলিমদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্তমানে জিহাদের বিধান কী, জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আকিদা-বিশ্বাস মানুষের সামনে তুলে ধরেন না। অনেকেই পরিকল্পিতভাবে এমনটা করে থাকেন। এগুলো কি 'কিতমানুল ইলমের' অন্তর্ভুক্ত নয়? ইসলামের চির দুশমন সন্ত্রাসী ইহুদি আলিমরা কি সাধারণ মানুষদের সাথে এমনটা করত না? তাদের কর্ম ও আমরা যারা হকের দাবিদার তাদের কর্মের মাঝে ব্যবধান কী? এমন একজন পীর সাহেবের কথাও শুনেছি, তার এক শিষ্য নামাজে জিহাদের আয়াত পড়ার কারণে তার না-কি নামাজে খুঁশু-খুজু চলে গেছে!!! 'নফসের জিহাদ বড় জিহাদ, এই জামানায় সশস্ত্র বিপ্লব অসম্ভব, এই জামানায় সশস্ত্র বিপ্লব মানে আত্মঘাতি বিপ্লব, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা জিহাদ, এ ধরনের আরো কুরআন ও সুন্নাহ-বিরোধি কথাবার্তা তথাকথিত আমিরুল মুজাহিদিনরা অহরহ বলে বেড়াচ্ছে। এ ধরনের বুলি আওড়িয়ে মুসলিমদেরকে আসল জিহাদ থেকে বিরত রাখা এবং নিজেদের মসনদ ও গদি ঠিক রাখা ছাড়া আর কী হতে পারে? এটা কি আখিরাতের ভালোবাসার ওপর দুনিয়ার ভালোবাসাকে প্রধান্য দেয়া নয়? *অনুবাদক*

সংমিশ্রণ থেকে বাঁচতে জরুরি হলো, সব বিষয়কে আসল-মূল নামে নামকরণ করা; এবং শরিয়তের পক্ষ থেকে যে বস্তু জন্য যে শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, সে শব্দ দিয়েই তা ব্যক্ত করা। বিশেষত, আমরা যখন মুসলিম উম্মাহর জীবনে এই স্বয়ংক্রিয় প্রভাবশালী শক্তি (তথা জিহাদ) নিয়ে আলোচনা করব, যেন আমাদের জন্য সহজ হয়—জিহাদের আসল মর্ম বুঝা এবং কাফিরদের সাথে মুসলিমদের আচরণবিধি অনুধাবন করা। সুতরাং যারা মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার করে এবং আল্লাহ-নির্দেশিত পথ ব্যতীত অন্য পথে চলে, কিংবা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতা করে, চাই তা সামরিক সহযোগিতার[১৮] নামে হোক বা জাতিসংঙ্ঘের[১৯] কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নামেই হোক, তারা কাফির

১৮. শাইখ আহমাদ শাকের রাহি. বলেন, 'সাবধান! পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের প্রত্যেক মুসলিম জেনে রাখুন, যে মুসলিম ইসলামের শত্রুদের তথা ব্রিটেন, ফ্র্যান্স (আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত ও চীন) এবং তাদের মিত্র ও এজেন্টদেরকে যে-কোনোভাবে সহযোগিতা করবে অথবা তাদের সাথে সন্ধি করে, অতঃপর সামর্থ্যনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, আর কথা ও কর্মের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা মুসলিমদের তো দূরের কথা এগুলোর যে-কোনো একটা করবে অতঃপর নামাজ পড়রে তাহলে তার নামাজ বাতিল ও নষ্ট হয়ে যাবে। অজু, গোসল অথবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে যে পবিত্রতা অর্জন করবে তা বাতিল হয়ে যাবে। যে ফরজ বা নফল রোজা রাখবে তার রোজা বাতিল হয়ে যাবে। যে হজ করবে, ফরজ জাকাত অথবা নফল দান করবে, এসব বাতিল বলে গণ্য হবে। সে তার প্রতিপালকের জন্য যে-কোনো ইবাদতই করুক তা প্রত্যাখ্যাত হবে। কোনো আমলের কারণে সে সাওয়াব পাবে না; রবং উল্টো তার আমলনামায় গুনাহ যোগ হতে থাকবে। সুতরাং সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো, ঈমানবিধ্বংসী কথা বা কর্ম অথবা বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকা।' [*কালিমাতুল হক*, পৃষ্ঠা : ১৩৭।]

১৯. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীবাহিনী ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত একটি কুফফার বাহিনী। কুফফার জোটের সম্মিলিত চক্রান্তে ১৯২৪ সালে উসমানি খেলাফত ধ্বংসের পর মুসলিম-বিশ্ব হয়ে পড়ে অভিভাবকহীন। বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য আর বিপর্যয় তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাঁচটি শীর্ষ ক্রুসেডার রাষ্ট্র আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্র্যান্স ও চীন সম্মিলিতভাবে ১৯৪৫ সালে গড়ে তুলে জাতিসংঘ জোট। মুসলিমরা যেন তাদের হারানো খেলাফত ফিরে না পায় এবং পুনরায় সংঘটিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে না পারে এই হীনমানসে পরবর্তীকালে কুফফার জোট এই জাতিসংঘকেই ব্যবহার করে। এ সংঘের মাধ্যমে ক্রুসেডার রক্তখেকো দানবগুলো চড়ে বসে নেতৃত্ব ও অভিভাবকহীন মুসলিমজাতির অভিভাবকের আসনে। মুসলিম-দেশগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে অভিশপ্ত

জাতিয়তাবাদের স্লোগান তুলে। তাদেরকে ধরিয়ে দেয়া হয় আলাদা আলাদা পতাকা। ইসলমি শরিয়ার বদলে কুফরি গণতান্ত্রিক সিস্টেম চালু করে প্রতিটি রাজ্যে চাপিয়ে দেয় তাদের পা চাটা সরকার। মুসলিমদের কতৃত্ব, অধিকার, সম্পদ সবকিছুকে কুক্ষিগত করে তাদের গলায় পড়িয়ে দেয় গোলামের জিঞ্জির।

জাতিসংঘ-শান্তিরক্ষা-মিশনের পরিচয় : জাতিসংঘ নামের এই কুফরি জোট গঠন করার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে সকল কাফির জাতি এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। এই কুফরি জোটের মূল হর্তাকর্তা হলো, আমেরিকা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য/ব্রিটেন, রাশিয়া এবং চীন।

এরা জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য। এই পাঁচটি দেশের রয়েছে ভেটো ক্ষমতা। জাতিসংঘের যে-কোনো সিদ্ধান্ত তাদের যে-কারো স্বার্থের বিপরীতে হলে, তারা এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। জাতিসংঘের সকল সিদ্ধান্ত এই পাঁচটি রাষ্ট্র নিজেদের পারস্পারিক সম্মতিতে গ্রহণ করে থাকে। এই কুফফাররা বিশ্বব্যাপী নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি জোরদার, ইসলাম বিরোধি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৮ সালে গঠন করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষাবাহিনী। যারা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা-মিশন পরিচালনা করে থাকে। মূলত শান্তিরক্ষার নামে সাধারণ মানুষদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে কাফিরদের স্বার্থরক্ষা করা, ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করা, মুসলিম-ভূখণ্ডগুলোকে দখল করা এবং সারা বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি করা এই ধোঁকাবাজ শান্তিবাহিনীর প্রধান মিশন।

শান্তিরক্ষার নামে ইসলাম ধ্বংসের আয়োজন :

কথিত শান্তিরক্ষা-মিশনের এই শয়তানি বাহিনী গঠনের পর পরেই ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাঈল-যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া অবৈধ রাষ্ট্র ইজরাইলের স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য এটিকে ব্যবহার করা হয়। কুফফার সংঘের প্রত্যক্ষ মদদে এই যুদ্ধে ইজরাইল জয়লাভও করে। পরিণামে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রথম কেবলা মাসজিদুল আকসা মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এটি কথিত শান্তিরক্ষা-মিশনের প্রথম সাফল্য। এরপর এই মিশনের ইসলামবিধ্বংসী কার্যক্রম দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের উত্থানরোধ, মুসলিম ভূমি দখল, মুসলিম দেশে মুরতাদ সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজে কুফফারসংঘ এই মিশনকেই সুকৌশলে ব্যবহার করছে। বর্তমান বিশ্বে আমরা দেখতে পাই, আমেরিকা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও চীন সক্রিয়ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে। বাহ্যিকভাবে তাদের নিজেদের মাঝে যতই বাণিজ্যিক ও ভূরাজনৈতিক বিরোধ থাকুক না কেন ইসলামের ইস্যু আসলে কাফির-জাতিসমূহ নিজেদের সকল বিভেদ ভুলে একই প্ল্যাটফ্রমে চলে আসে। তাই তো দেখা যায় আফগানিস্তান, সোমালিয়া, মালি, চেচনিয়া, পূর্ব তুর্কিস্তানসহ যেখানেই মুজাহিদরা ইসলামি শরিয়া বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে, সেখানে ঘুরেফিরে এই কুফফার-দেশগুলোই ইসলামি

শরিয়া ধ্বংস করে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি কুফরি ধর্ম ও মতবাদগুলো চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে।

শান্তিরক্ষা-মিশনের মুখোশ উন্মোচন :

১৯৪৮ সাল থেকে এই পর্যন্ত কুফফারসংঘের শান্তিরক্ষাবাহিনী বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬৩টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। যার মধ্যে ১৩টি এখনো চলমান রয়েছে। বর্তমানে এই শয়তানি বাহিনী শান্তিরক্ষার নামে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ পরিচালনা করছে এবং অনেকগুলো যুদ্ধে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু ব্যাক্তি লক্ষ করলে সহজেই বুঝতে পারবেন, এই যুদ্ধগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং কাফিরদের স্বার্থে করা হচ্ছে। মানব-ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বড় গণহত্যাগুলোর নায়ক কুফফার জোটের পাঁচ স্থায়ী সদস্য আমেরিকা, ফ্র্যান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও চীন। দূর অতীতের ক্রুসেডের ইতিহাসে না গেলেও চলবে, কেবল নিকট অতীতের দৃশ্য এবং বর্তমানের বীভৎস ঘটনাপ্রবাহগুলো দেখলেই বুক কেঁপে উঠে। আন্তর্জাতিক গবেষণাসংস্থা গ্লোবাল রিসার্সের জরিপমতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কেবল ৭৩ বছরে ৩ কোটি বেসামরিক মানুষ হত্যা করেছে আমেরিকা। আহত করেছে ৩০ কোটি মানুষকে। রাশিয়ার মুসলিম গণহত্যার ফিহরিস্ত এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। ১৯১৭ সালেই কেবল বলশেভিক বিপ্লবের পদতলে ৬০ থেকে ৬৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ৬ কোটি থেকে ৬ কোটি ৫০ লাখ মুসলিম প্রাণ হারায়। এই মুসলিমরা পৃথিবীর যে ভূখণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে ছিল, তার পরিমাণ ১৫ মিলিয়ন বর্গমাইল, যা আফ্রিকা মহাদেশের আয়তনের চেয়েও বেশি। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীনের বর্বরতা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। পুরো জিংজিয়ান প্রদেশকে মুসলিমশূন্য করার প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে চীন।

ক্রুসেডের দুই মূলভিত্তি ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের মুসলিম-নিধনের ইতিহাস কারো অজানা নয়। দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরা এখানে উদ্দেশ্য নয়; বরং আমরা কেবল এতটুকু বুঝাতে চাই, মানবজাতির ইতিহাসের জঘন্য বর্বর ও নরপিশাচ শয়তানগুলো নিয়ে গঠিত হয়েছে এই জাতিসংঘ নামের রক্তখেকো দানবসংঘ। এই রক্তখেকো দানবগুলোর প্রত্যক্ষ মদদে আজ মুসলিম-বিশ্বের ওপর চলছে নারকীয় তাণ্ডব। আফসোস, আমাদের অনেক মুসলিম ভাই এখনো জাতিসংঘের আসল চেহারা চিনতে পারে নি। এখনো অনেকেই এমন আছেন, যারা বিশ্বাস করেন যে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষাবাহিনী সমগ্র পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার জন্য কাজ করছে। এরা এক দিকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং মুসলিমদের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায় আর অপরদিকে সেই একই যুদ্ধে আহতদের জন্য হাসপাতাল, স্কুল, কারিগরি শিক্ষা, বিনামূল্যে খাবার-রেশন ইত্যাদি নানা সুবিধা দিয়ে উদ্বাস্তু মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণা করে তাদের মন জয় করার চেষ্টা করে। অসহায় মুসলিমদের সাহায্যে বিভিন্ন এন জি ও লাগিয়ে দিয়ে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার

চেষ্টা করে। বিষয়টিকে আরো ভালোভাবে বুঝতে হলে, আরাকানের মুসলিমদের গণহত্যার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী রাষ্ট্রগুলোর একটি হলো চীন। এ চীনের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় মায়ানমারের সেনাবাহিনী আমাদের অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালায়। আরেক স্থায়ী সদস্য আমেরিকার মদদপুষ্ট ইজরাইল অস্ত্র ও ট্রেনিং দিয়ে মায়ানমার-বাহিনীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে। আবার অন্য দিকে সেই একই জাতিসংঘ মমতাময়ী মায়ের মতো রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য বিনামূল্যে খাবার, পানি, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ বিভিন্ন সেবার পসরা নিয়ে হাজির হয়ে গেল এবং খ্রিষ্টান এন জি ও-গুলোর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে লেগে গেল। কতই না সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র! অথচ সাধারণ মানুষ মনে করছে, জাতিসংঘের ইউনিসেফ, ইউ এন এসি সিয়ার নামের প্রতিষ্ঠানগুলো কতই না মানবদরদি!! আরো একটি বিষয় দেখুন, আফগানিস্তানে যখন মুজাহিদরা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করল, কুফফারসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ইসলামি শরিয়াকে উৎখাত করার জন্য সেখানে চলে গেল। একইভাবে সোমালিয়া ও মালিতেও শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অথচ মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে পিঁপড়ের মতো পিষে মারা হচ্ছে, তারা কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে সেনা পাঠাচ্ছে না। চীনের উইঘুরে দশ লক্ষ মুসলিমকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং তাদেরকে কমিউনিস্ট বানানো হচ্ছে। কিন্তু শয়তানি সংঘ সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সেনা পাঠাচ্ছে না। কেননা তারা নিজেরাই তো এ বর্বরতা চালাচ্ছে। দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে গো-পূজারি সন্ত্রাসী মালাউন হিন্দুরা কাশ্মিরের মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে। কিন্তু কুফফারসংঘ কেবল বিবৃতি দিয়েই খালাস। একইভাবে দেখুন, ফিলিস্তিন, ইয়ামেন, সিরিয়া, চেচনিয়া ও বসনিয়ার দিকে। সর্বত্রই এই কুফফার-সংঘ মুসলিম-নিধনের মিশন পরিচালনা করছে।

মুসলিমদের সাথে জাতিসংঘের প্রতারণা : আশ্চযের বিষয় হলো, শান্তিরক্ষা-মিশনের নামে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কুফফার-সংঘ খোদ মুসলিমদেরকেই ব্যবহার করছে। কতই না নির্মম এ ধোঁকা! মুসলিম-দেশগুলোতে তাদের বসানো মুরতাদ শাসকদেরকে কাজে লাগিয়ে কথিত শান্তির মিশনের জন্য তারা মুসলিম যুবকদেরকেই নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কাতার, ইরান ইত্যাদির মতো মুসলিম-রাষ্ট্রগুলো আজ সাধারণ মুসলিমদের ধোঁকা দিচ্ছে, তাদের সাথে প্রতারণা করছে এবং তাদেরকে বোকা বানিয়ে তাদের সন্তানদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে। আজ অনেক জাহেল আলিমও জাতিসংঘের এই ধোঁকায় পড়ে জাতিসংঘের পক্ষে সাফাই গাইছে। কুফফার-মিডিয়ার অপপ্রচার শুনতে শুনতে তাদের বিবেচনাবোধ লোপ পেয়ে বসেছে, হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের আত্মপরিচয়। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করার বিধান : শাইখুল ইসলাম সাইয়িদ মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহিমাহুল্লাহ কাফিরদেরকে সাহায্য করার বিধান সম্পর্কে বলেন, 'কোনো মুসলিম যদি কাফিরদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাহায্য ও বিজয়ের জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অথবা যুদ্ধে তাদের সহায়তা করে কিংবা যখন কাফির ও মুসলিমদের মধ্যকার যুদ্ধে কাফিরদের সমর্থন জানায়, তাহলে সে নিশ্চিত কাফির এবং নিকৃষ্টতম কাফির। সে শুধু মুসলিম হত্যায় জড়িত হয়েছে তা নয়; বরং ইসলামের বিরুদ্ধে হকের শত্রুদের আনুগত্য ও সহায়তা করেছে। আর এটা সকলের মতানুসারে সুস্পষ্ট কুফর। [অধ্যায় কতলে মুসলিম, *মাআরিফে মাদানি*, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি। সংকলন ও বিন্যাস : মুফতি আবদুস শাকুর তিরমিজি]

ব্রিটেন অর্থাৎ বর্তমান যুক্তরাজ্য যখন উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ফিলিস্তিনের বাইতুল মাকদিসে আক্রমণ করে, তখন হিন্দুস্থান থেকে প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেয়। এ সময় শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রাহি. তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে নিম্নের ফাতওয়া প্রদান করে বলেন, 'বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর আক্রমণকে লর্ড জর্জ 'ক্রুসেড' আখ্যায়িত করেছে। চার্চিলও এটিকে 'ক্রুসেড' বলে উল্লেখ করেছে। তাই আমি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি, যে মুসলিমই খ্রিষ্টানদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, সে শুধুমাত্র গুনাহই করে নি; বরং কাফির হয়ে গেছে।' [*ওলামায়ে হক*, মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া, পৃষ্ঠা : ২১৫] **জাতিসংঘ-শান্তিরক্ষা-মিশনে বাংলাদেশ :** ১৯৮৮ সাল থেকেই জাতিসংঘ-শান্তিরক্ষা-মিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনী ক্রুসেডারদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাতদিন লড়াই করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মুসলিমকে ধোঁকা দিয়ে পশ্চিমাদের পা-চাটা তাগুত সরকার মুসলিম-সন্তানদেরকে দিয়েই এই জঘন্য কাজ করাচ্ছে। বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা-মিশনে অংশগ্রহণে প্রথম সারির একটি দেশ। ১৯৮৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও পুলিশ মিলিয়ে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৫৮৫ জন কুফফার-সংঘ শান্তিরক্ষা-মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মিশন ছিলো, সরাসরি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে। শান্তিরক্ষা-মিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এর রিপোর্ট অনুযায়ী শান্তিরক্ষা-মিশনে বাংলাদেশের র‍্যাংকিং দ্বিতীয় এবং মিশনে কাজ করছে বাংলাদেশের ৬৪৫৪ জন সৈনিক। ২০১৮ সালের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে শান্তিরক্ষা-মিশনে বাংলাদেশের ১৩২ জন শান্তিরক্ষী প্রাণ দিয়েছে। **ফুকাহায়ে কেরামের এ ব্যাপারে ইজমা আছে যে, ইসলাম ও কুফরের চলমান লড়াইয়ে যে বা যারা কাফিরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, অস্ত্র, ঘাঁটি বা সম্পদ দিয়ে অথবা সমর্থন জুগিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করবে, মুসলিম হত্যা বা গ্রেফতারে তাদের ইন্ধন জোগাবে, অথবা যে-কোনোভাবে এ যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ নেবে, সে**

কাফির ও মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে। মারা গেলে জানাযা পড়া যাবে না। মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন দেয়া যাবে না।

প্রিয় উম্মাহ! একটু সতর্ক হোন, চিন্তা করুন, বাংলাদেশের এ সৈন্যগুলোর কী অবস্থা হবে? আফসোস, দাজ্জালি মিডিয়ার অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আজ অবুঝ মুসলিমরা তাদেরকে বাহবাহ দিচ্ছে, তাদেরকে নিয়ে গর্ব করছে। পৃথিবীতে আল্লাহর শরিয়া, ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে মিটিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে তারা কাফিরদের কীভাবে সঙ্গ দিচ্ছে এবং জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তার কিছু আলোচনা এখানে তুলে ধরব। সোমালিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যখন মুজাহিদরা ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠা করে ফেলে, তখন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী-বাহিনী এবং পর্যায়ক্রমে পাশ্ববর্তী খ্রিষ্টান ক্রুসেডার দেশ ইথিওপিয়া, কেনিয়া এবং জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত আফ্রিকান ক্রুসেডার জোট 'আমিসোন' শান্তিরক্ষার অজুহাতে মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ চালায়। অথচ কাফিরদের কথিত শান্তিরক্ষা যে একটি প্রহসন-মাত্র, এটা তারা নিজেদের মুখেই স্বীকার করে নিয়েছে। যখন জাতিসংঘ খ্রিষ্টানদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে লেগে গেল, তখন সেই কুফফারের সাথে যোগ দিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম-নামধারী এই মুরতাদদের হটিয়ে পুনরায় ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে এনেছে কালো পতাকাবাহী মুজাহিদরা। এই হলো আমাদের বাংলাদেশের তাগুতবাহিনীর আসল চেহারা। মুসলিমদের ট্যাক্সের টাকায় লালিত-পালিত হয়ে আবার ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর এদের শক্তির মূল উৎস হলো, জাতিসংঘসহ বৈশ্বিক কুফফারগোষ্ঠী। যেমনিভাবে আমেরিকাসহ সর্বমোট ষাটটি দেশ কুফফার-জোট ন্যাটোর নেতৃত্বে এবং জাতিসংঘের সম্মতিতে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে মালিতে আগ্রাসন চালিয়েছে ক্রুসেডার ফ্রান্সসহ একান্নটি দেশ। আফগানিস্তান ও মালি এ দুটি দেশে হত্যাকাণ্ড চলছে জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ মদদে। কুফফার এ হত্যাযজ্ঞের নাম দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অনেকেই হয়তো জানেন না, আফগানিস্তান এবং মালি এ দুটি দেশেই চলমান আগ্রাসনে বাংলাদেশ জড়িত। আফগানিস্তানে আগ্রাসনের জন্য মার্কিন ক্রুসেডার বাহিনীকে বাংলাদেশের আকাশপথ এবং জলপথ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে রেখেছে বাংলাদেশের মুরতাদ সরকার। আর মালিতে চলমান আগ্রাসনে সরাসরি সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। শান্তিরক্ষা-মিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, মালিতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে শান্তিরক্ষা-মিশনে কাজ করছে ১২৬০ জনের একটি দল। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী এবং সরকারের ইরতিদাদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য আর কী প্রমাণ দরকার? সূত্র : বয়ান থেকে সংগৃহীত।

ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। যারা জেনেশুনে এবং বাধ্য হওয়া ব্যতীত তাগুতগোষ্ঠীকে শক্তিশালী করবে, তাদের জন্যও রয়েছে জুলুমের এক অংশ।

আমি মুসলিম উম্মাহর তরুণদেরকে জলদগম্ভীর ভাষায় আহ্বান করছি, তারা যেন জালিম শাসকদের আনুগত্য ও গোলামির বেড়ি গলা থেকে ছুড়ে ফেলে[২০] এবং এই সংকটময় পরিস্থিতিতে এমন এক শক্তিশালী নিরাপদ

---

২০. পুরো বিশ্বের মুসলিম-দেশগুলোর শাসকবৃন্দ ও বিচারকরা মুরতাদ এবং যত সশস্ত্র বাহিনী আছে, সেসব বাহিনী তাগুতি বাহিনী আর তারা দলগতভাবে মুরতাদ বাহিনী। কারণ, তারা আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত কুফরি আইন সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সেগুলো দ্বারা তারা বিচারকার্য পরিচালনা করছে। এদের মুরতাদ হওয়ার কারণ শুধু একটিই নয়; বরং অনেক কারণ রয়েছে। প্রত্যেকটি কারণ স্বতন্ত্রভাবে তাদেরকে মুরতাদ প্রমাণিত করে। আমরা এখন কিছু কারণ উল্লেখ করব—

এক. আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত কুফরি আইন দ্বারা তারা দেশ শাসন করছে।

দুই. ইসলামের কোনো বিধানকে কুসংস্কার অথবা ইসলামকে এই আধুনিক যুগে অচল বা সেকেলে [প্রাচীনকালীন] ধর্ম মনে করা কুফরি, আর এটা তারা করছে।

তিন. কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা কুফরি, আর এরা তা করছে।

চার. যেসব কাজ কাফিরদের নিদর্শন ও প্রথা, তা পালন করা কুফরি, আর এটা তারা করছে। **পাঁচ.** কারো কোনো 'কুফরি কাজের' সত্যায়ন বা সমর্থন করা কুফরি, আর এটা তারা করছে।

ছয়. কুফরিকে খেলার বস্তু বানানো কুফরি, আর এরা এটা করছে।

সাত. সারা পৃথিবীতে যেখানে মুজাহিদরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে, সেখানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে।

আট. এরা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করছে।

নয়. মুসলিম উম্মাহর যে-কোনো বিষয় নিয়ে কাফিরদের সাথে পরামর্শ করে।

দশ. এরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

যেহেতু এরা মুরতাদ, তাই এদের অনুসরণ তো প্রশ্নই আসে না; বরং এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান হলো, সামর্থ্য অনুপাতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা আবশ্যক। আর জিহাদের আগে একটা প্রস্তুতিপর্ব আছে, সেই প্রস্তুতিপর্ব এখন থেকেই নেওয়া প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর ওপর আবশ্যক। বলাবাহুল্য যে, এখন তো জিহাদ ফরজে আইন। তাই এ ক্ষেত্রে নর-নারীর বিধান একই।

নেতৃত্ব[২১] প্রতিষ্ঠা করে, যা মুসলিম উম্মাহকে কাফিরদের আগ্রাসন থেকে প্রতিরোধ ও হিফাজত করবে। আর ইসলাম ধর্মের 'শাআইর' তথা জিহাদ

এজন্য যারাই আমরা যে দল করছি এবং যারা কোনো দল করছি না, তারা সকলেই মিলিত হোন জিহাদের পতাকাতলে। কিনে নেন শাহাদতের বিনিময় জান্নাতের বাড়ি। যদি বাস্তবিক অর্থে আপনি আল্লাহর দীন পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করেন, তাহলে জান্নাতে আপনার বাসস্থান নিশ্চিত। বিনা হিসেবে আপনার জন্য জান্নাত অবধারিত। আল্লাহ সকলকে কবুল করুন। আমিন। *অনুবাদক*

২১. মুসলিম উম্মাহ! মুসলিম উম্মাহর রয়েছে দীর্ঘকালের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। তারা বিশ্বকে শাসন করেছে শতাব্দির পর শতাব্দি। প্রায় পুরো পৃথিবীকে তারাই একমাত্র নিয়ন্ত্রণ করেছে। তারাই ছিল সে-সময়ের একমাত্র বিজয়ী জাতি এবং বিশ্ববাসীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির রোল-মডেল এবং গাইডলাইন। তারা তো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করতই, এমনকি আল্লাহর চির দুশমন কাফিররাও খেলাফত বা ইসলামি শাসনব্যবস্থার অধীনে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করত। ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ছিল তাদের জান-মালের নিরাপত্তা।

বন্ধুগণ! এখন মুসলিম উম্মাহর অবস্থা কী? না আছে তাদের ধন-সম্পদের নিরাপত্তা আর না আছে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু! তোমার মুসলিম মা-বোন নরপিশাচ কাফিরদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, তোমারই ছোট্ট ভাই আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুসলিম উম্মাহর চিরশত্রু কাফিরদের রোস্ট ও গ্রীল বনছে, তোমার ভাই-বোনদের বাড়ি-ঘরগুলো জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দিচ্ছে এবং টনকে টন বোমা ফেলে তাদের শহরগুলোকে হাজার বছরের পুরোনো বাড়ি ও বিরান ঘরে পরিণত করছে। পৃথিবীতে নির্যাতিত ও নিপীড়িত কোনো জাতি থেকে থাকলে, তারা হলো মুসলিমজাতি। আচ্ছা বন্ধুগণ! বলো তো, এ অবস্থা কেন? কোন জিনিসকে ছেড়ে দেয়ার কারণে তাদের আজ এই করুণ অবস্থা? আজকের আলোচনা এ প্রশ্নের জবাব নিয়েই। তবে নিজের পক্ষ থেকে নয়; বরং কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামি ইতিহাসের ঝর্ণাধারা থেকে—

عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم - : (يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها)قال : قلنا يا رسول الله! ومن قلة نحن يومئذ؟ قال : (بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن) فقال قائل : يا رسول الله : وما الوهن؟ قال : (حب الدنيا وكراهية الموت). أخرجه أحمد في مسنده ، ج -٥ ص-٢٧٨

রাসুল [সা.]-এর আজাদকৃত গোলাম হজরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি [সা.] বলেছেন, খাবারে সজ্জিত প্লেটের প্রতি ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা যেভাবে একে অপরকে আহ্বান করতে থাকে ঠিক তেমনি অচিরেই এমন একটা সময় আসবে, যখন পুরো পৃথিবীর সব জায়গা থেকে কাফির সম্প্রদায়গুলো একে অপরকে তোমাদের (মুসলিমদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে থাকবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! সেদিন কি মুসলিমদের সংখ্যা কম হবে? তিনি বললেন, না; সেদিন তোমাদের সংখ্যা থাকবে অনেক; কিন্তু তোমরা বন্যার পানির সাথে ভেসে যাওয়া ফেনা ও খড়কুটার মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে ঢেলে দেবেন 'ওহান'। কোনো এক প্রশ্নকারী বলল, হে আল্লাহর রাসুল! ওহান কী জিনিস? রাসুল [সা.] বলেন, 'দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুকে (শাহাদাত) অপছন্দ করা'। [মুসনাদু আহমাদ, খণ্ড : ৫, পৃ. ২৭৮

সচেতন পাঠক! রাসুল [সা.]-এর সেই ভবিষ্যদবাণী কি আজ আমাদের জীবনের বাস্তবতা নয়? এ হাদিসটি কি মুসলিম উম্মাহর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে এবং শতভাগ প্রয়োগ হচ্ছে না? এর জন্য কি রাসুল দায়ি না-কি আমরা দায়ি? মুসলিম উম্মাহর ওপর তো জরুরি ছিল, এ হাদিস থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবনে শতভাগ বাস্তবায়ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। 'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করার' দ্বারা রাসুল [সা.] পরোক্ষভাবে 'জিহাদ ও কিতাল'কে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কারণ জিহাদের জন্য 'দুনিয়ার ভালোবাসা' বর্জনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং 'মৃত্যু'কে যে কী পরিমাণ পছন্দ ও ভালোবাসতে হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কথাটিই সামনের একটি হাদিস থেকে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে ইন শা আল্লাহ—

عن ابن عمر – رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله –صلى الله عليه و سلم-يقول : إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، و رضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلّط الله عليكم ذلاً لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم . رواه أحمد (٤٩٨٧) وأبوداود (٣٤٦٢)

হজরত ইবনু ওমর [রা.] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল [সা.]-কে বলতে শুনেছি, 'যখন তোমরা 'ইনা' নামক সুদি কারবার করবে, গরুর লেজ ধরবে, কৃষি কাজ নিয়ে খুশি থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। আর তিনি তোমাদের থেকে ওই লাঞ্ছনা দূর করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মের তথা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে। [*মুসনাদুল ইমাম আহমাদ*, হাদিস : ৪৯৮৭; *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ৩৪৬২।]

ইত্যাদি নিয়ে যেসব মিডিয়াকর্মীরা[২২] ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা উপহাস করে, সেসকল ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী মিডিয়াকর্মীরা যিন্দিক[২৩] ও মুরতাদ। মুসলিম উম্মাহর

সম্মানিত পাঠক! রাসুল [সা.] মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে বলেছেন, যখন তোমরা বাহানা অবলম্বন করে সুদি কারবারে জড়িত হবে, দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে আখিরাতের ওপর প্রধান্য দেবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, এ কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ার মানুষের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। তবে তখনই তোমরা এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করবে, যখন তোমরা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করবে, আল্লাহর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা পরিহার করবে, আখিরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রধান্য দেবে এবং জিহাদের পদ্ধতিতে দীন প্রতিষ্ঠার দিকে ফিরে আসবে। যখন মুসলিম উম্মাহ কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, তখন তাদের অর্জিত হবে শক্তিশালী নিরাপদ নেতৃত্ব। যখনই কাফিররা মুসলিম-ভূখণ্ডে আক্রমণের ইচ্ছা করবে, তখনই তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে এক শক্তিশালী প্রতিরোধশক্তি। সেই শক্তিশালী প্রতিরোধশক্তির নামই জিহাদ। এর মাধ্যমেই অর্জিত হবে শক্তিশালী নিরাপদ নেতৃত্ব। আর তখনই মুসলিমরা সেই শক্তিশালী নেতৃত্বের ছায়াতলে থাকবে শান্তি ও নিরাপদে। হে আল্লাহ! মুসলিম উম্মাহকে সেই শক্তিশালী নিরাপদ নেতৃত্ব অর্জনের পথে ধাবিত হওয়ার তাওফিক দান করো। আমিন।

২২. ঈমান ও কুফরের লড়াই চিরন্তন। শুরু হয়েছে পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে, যা আজ অবধি বাকি আছে। তবে পরিবর্তনের ছোঁয়া পেয়েছে যুদ্ধ-লড়াইয়ের ধরণ ও আকৃতিতে। এক সময় পক্ষ-বিপক্ষের যুদ্ধ হতো শুধু বাহ্যিক আসবাবপত্র এবং বস্তুগত জিনিস দ্বারা। যেমন : তীর, ধনুক, তলোয়ার, বর্শা, অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ও গোলাবারুদ ইত্যাদি। কিন্তু এখন আর সেই যুদ্ধের ধরণ ও প্রকৃতি আগের অবস্থায় বহাল নেই। যুদ্ধের কৌশল ও ধরণের সাথে নতুনমাত্রায় যুক্ত হয়েছে যুদ্ধের অভিনব ভয়ংকর কৌশল। সেই অভিনব ভয়ংকর যুদ্ধ-কৌশল হলো, মুসলিমদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড বা চিন্তাযুদ্ধ। এ যুদ্ধের লক্ষ্য হয়ে থাকে, শত্রুপক্ষের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আঘাত করা। এ যুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের সাহায্যে আক্রমণ করার চেয়ে বহুগুণ ভয়ংকর। বাহ্যিক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে কোনো মুসলিম দেশে অভিযান পরিচালনা করলে, মুসলিমরা কাফিরদেরকে শত্রু মনে করে এবং সাধ্যে যতটুকু আছে, তা দ্বারা কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অকাতরে বিলিয়ে দেয় নিজেদের সবকিছুই। অপর দিকে মুসলিমদের টার্গেট করে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড বা চিন্তাযুদ্ধের মিশন চালানোর কারণে, মুসলিমরা কাফিরদেরকে শত্রুই মনে করে না; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো দূরের কথা! যারা কাফিরদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের কাছে মাথা নত করে, পরাজিত হয়, তাদের অনেকেই কাফিরদেরকে বন্ধু মনে করে এবং তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কোনো মুসলিম যদি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের শিকার

জীবন থেকে জিহাদকে মিটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এরাই হলো অভ্যন্তরীণ শত্রু। আর বহিরাগত শত্রু প্রতিরোধের ব্যাপারে কথা হলো, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে পূর্বে ঘটে যাওয়া ক্রুসেড-যুদ্ধগুলোর দিকে মুসলিম উম্মাহর গভীর দৃষ্টিপাত করা জরুরি; যাতে মুসলিমরা সেগুলো থেকে গ্রহণ করতে পারে শিক্ষা, উপদেশ ও পাথেয়।

কীভাবে ক্রুসেড-যুদ্ধগুলোর মোকাবিলা ও প্রতিরোধ করা সম্ভব? এ ব্যাপারে আমি বলব, মুসলিমদের এবং মুসলিম-ভূখণ্ডগুলোর ওপর পশ্চিমাদের দখলদারি ও আগ্রাসন নতুন কোনো ঘটনা নয়; বরং অতীতেও এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। আমাদের এবং তাদের মাঝে পরস্পর আঘাত-প্রতিঘাত ও মোকাবিলা—বহু শতাব্দি পূর্ব থেকেই চলে আসছে আর তা চলতেই থাকবে। কেননা হক-বাতিল এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে আঘাত-প্রতিঘাত ও পরস্পর প্রতিহতকরণের এই ধারা

হয়ে কাফিরদের হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে তো সে মুরতাদ হয়ই। এমনকি যে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের স্বীকার হয়ে, এমন আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে কিংবা কথা বা কর্ম করে যা ঈমান ভেঙে দেয়, তাহলেও সে মুরতাদ হয়ে যাবে। এজন্য চিন্তাযুদ্ধের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় হলো যে, কাফিরদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড বা চিন্তাযুদ্ধ কী কিংবা তার ধরণ ও প্রকৃতি কী তাও আজকের মুসলিমরা জানে না। যার ফলে অনায়েসেই মুসলিমরা নিজেদের অগোচরে চিন্তাযুদ্ধের মায়াজালে ফেঁসে যাচ্ছে। বুদ্ধিভিত্তিক ক্রুসেডের অন্যতম মাধ্যম মিডিয়াশক্তি। ইসলামের দুশমনরা মিডিয়া ও মিডিয়াকর্মীদের ব্যবহার করে ইসলামের শাআইর, জিহাদ ইত্যাদি নিয়ে উপহাস করছে, জিহাদকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ আখ্যায়িত করা হচ্ছে। সুতরাং এ শ্রেণির মিডিয়াকর্মীরা মুরতাদ বলে গণ্য হবে। *অনুবাদক*

২৩ 'যিন্দিক' শব্দটি মূলত ফার্সি। তার আসলরূপ ছিল-"زندہ گرد" এর থেকে আরবি শব্দ যিন্দিক। যিন্দিক বলা হয়, যে ব্যক্তি অন্তরে কুফরকে গোপন রাখে আর যখনই সুযোগ হয় তখনই গুপ্ত কুফরকে বারবার প্রকাশ করে। যিন্দিকের বিধান, তাকে কুফর ও রিদ্দাতের কারণে তাওবা চাওয়া ছাড়াই হত্যা করা হবে। ইমাম মালেক রাহি. বলেন, 'রাসুলের সময়কার নিফাকই আমাদের সময়ে তা জান্দাকা। যদি কারো ক্ষেত্রে জিন্দিক হওয়া প্রমাণিত হয় তার কাছে তাওবা চাওয়া ছাড়া হত্যা করা হবে। [*আল জামে' লি আহকামিল কুরআন* : ১/ ১৯৯।]

ইমাম আবু হানিফা রাহি. বলেন, 'তোমরা জিন্দিককে গোপনে হত্যা করো। কারণ, তার তাওবা জানা যায় না।' [*ইকফারুল মুলহিদিন*, পৃষ্ঠা : ৩৭।]

চলতে থাকবে কিয়ামত অবধি। আর দেশ ও দশের (ভূখণ্ড ও মানুষের) কল্যাণ ও সংশোধন লাভ হবে পরস্পর আঘাত-প্রতিঘাতের রীতি প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই। আল্লাহ বলেন—

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾

'আল্লাহ যদি কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত পুরো পৃথিবী।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫১।]

তাফসিরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'যদি মুমিন-মুসলিমরা কিতাল ও জিহাদের পন্থায় কাফিরদের প্রতিহত না করত, তাহলে কাফিররাই এ ভূপৃষ্ঠে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হতো। ফলে কাফিরদের ধ্বংসযজ্ঞ, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতার কারণে পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো।'

সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! তোমরা প্রতিহতের পথে ধাবিত হও; অগ্রসর হও প্রতিরোধের পথে। আর যেসব কাফির মুসলিম-ভূখণ্ডগুলোকে জবরদখল করে আছে, তাদের সাথে কথপোকথন হবে শুধু অস্ত্রের ভাষায়[২৪]; অন্য কোনো পন্থায় নয়।

---

২৪. শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি রাহি. বলেন, 'কাফিরদের সাথে কথপোকথন হবে জবাই ও হত্যার ভাষায়। ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু, কাফির, নাস্তিক ও মুরতাদদেরকে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম, অবাধ্যতা ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ রাখার একমাত্র উপায় তাদেরকে জবাই ও হত্যা করা। যাতে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ ধরনের কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে পলায়ন করে এবং শিক্ষা নেয়। আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে ওহির মাধ্যমে হুকুম দিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কাজেই তোমরা মুমিনদের পা স্থির রাখো, আমি কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দেব। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের ওপর আঘাত করো এবং তাদের আঙুলের জোড়াসমূহেরও আঘাত করো'। [সূরা আনফাল, আয়াত : ১২]

অপর আয়াতে তিনি বলেন, 'সুতরাং যুদ্ধকালে যদি তোমরা তাদেরকে নাগালের ভেতর পাও তবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা ও পরবর্তী প্রজন্ম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেখে পালিয়ে যায়, যেন তাদের উচিত শিক্ষা হয়'। [সূরা আনফাল, আয়াত : ৫৭]

আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও তখন তাদের গর্দান ও ঘাড়ে মারো। আর যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত করে ফেল তখন তাদেরকে শক্ত করে বাঁধো'। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ৪]

মুসলিম ও কাফিরদের দ্বন্দ্বপ্রকৃতি বিবেচনা করার পর আমরা দেখছি যে, কাফিরগোষ্ঠী আড়াই হাজার বছর আগ থেকেই মুসলিম-ভূখণ্ডগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। তাদের শুদ্ধ কোনো ধর্ম ছিল না আর তারা ছিল দুশ্চরিত্র লোক। তাদের কাজই ছিল, জোরপূর্বক সম্পদ আত্মসাৎ করা। আর আমাদের বাপ-দাদারা পশ্চিমা দখলদারির অধীনে দীর্ঘ দশ শতাব্দিরও অধিক সময় অতিবাহিত করেছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব এবং বাস্তব অর্থে ইসলামকে জীবনে ধারণ করার পরই আমরা জালিম-অত্যাচারি কাফিরদের পরাজিত করতে পেরেছি। ইসলাম ফিরিয়ে এনেছে খাঁটি আরবীয় ব্যক্তিত্ববোধ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো আরবকে জাহিলি[২৫] সভ্যতা থেকে মুক্ত করেছেন; তা হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করেছেন। তিনি পৃথিবীর দিকপ্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজ বাহিনী। যার ফলে ঈমানি ভ্রাতৃত্বে পূর্ণ সেই বাহিনীতে আশ্রয় নিয়েছেন আরব ও অনারব সকলেই। আল্লাহু আকবার ধ্বনির সামনে মাথানত করেছে তৎকালীন সুপার পাওয়ার পারস্য, তাতারি-তুর্কি জাতি ও রোমানগণ। আর তখন পৃথিবীর নেতৃত্বের বাগডোর ছিল আমাদের হাতেই।

সুতরাং এটাই হলো, আল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধান। কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম বন্ধের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গি তথা তাদের হত্যা করা, রক্ত প্রবাহিত করা, গর্দানে আঘাত করা ইত্যাদির মাধ্যমেই সম্ভব। যার ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে আর পরবর্তী প্রজন্ম এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম করার সাহসই পাবে না। (জেলখানায় অবস্থানকালে শাইখের জুমার বয়ান। ৪ রজব ১৪২৫ হিজরি।

২৫. শাইখ আবদুর রহমান দাওসিরি রাহি.-কে প্রশ্ন করা হলো, জাহিলিয়াত বা মূর্খতা-বর্বরতা কি পূর্বযুগের সাথে সীমাবদ্ধ না-কি তার ধরণ ও প্রকৃতিতে নতুনত্ব হতে পারে? শাইখ বলেন, 'জাহিলিয়াত আগের যুগের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জাহিলিয়াতের বিশেষ একটা ধরণ ও প্রকৃতি রয়েছে যার সাথে যে-কোনো সময়ের যে-কোনো ব্যক্তি বা জাতি সম্পৃক্ত হতে পারে। তিনি বলেন, বর্তমান যুগের জাহিলিয়াত পূর্বেকার জাহিলিয়াত থেকে আরো ভয়ংকর। কারণ, এই আধুনিক ডিজিটাল যুগে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও অনুগ্রহ অস্বীকার করার প্রতি প্ররোচনা দেয়া হয় বা স্রষ্টাকে অস্বীকার করা হয় বা আল্লাহপ্রদত্ত দীন ও শরিয়তকে অবজ্ঞা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয় বা অশালীনতা, অনৈতিকতা ও বেহায়াপনাকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করা হয় অথবা লজ্জা-শরম ও আত্মমর্যাদাবোধ দূরীভূত হয়ে যাওয়া। এগুলোর কোনোটি আবু জাহেল, আবু লাহাব ও তাদের পূর্ববর্তী কোনো সময়ে ছিল না। [*আল-আজবিবাতুল মুফিদা লি মুহিম্মাতিল আকিদা*, পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৫।]

আমরাই তো মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে এসেছি। অতঃপর যখন ধর্মের সাথে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ল এবং আমাদের শাসকরা খারাপ হয়ে গেল, তখন 'ওহান' (দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভয়) আমাদের পেয়ে বসল এবং চতুর্দিক থেকে আমাদের জেঁকে ধরল। আর তখনই রোমান খ্রিষ্টানরা কয়েক শতাব্দির ক্রান্তিলগ্নে আবারও তাদের সেই প্রসিদ্ধ ক্রুসেড-যুদ্ধের দামামা বাজাল, আওয়াজ তুলল। মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের চলতে থাকল ক্রুসেডযুদ্ধ। এক পর্যায়ে মুসলিমদের প্রথম কিবলা 'বায়তুল মাকদিস'কে[২৬] মুসলিমদের থেকে ছিনিয়ে নিল; কিন্তু আমরা বসে থাকি নি; শক্তি সঞ্চয় করেছি—আমাদের ধর্মে পূর্ণরূপে ফিরে আসার মাধ্যমে। দখলের নয় দশকের শেষে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে মহান এক নেতা শক্তিশালী এক পন্থায় ক্রুসেডারদের হাত থেকে তা পুনরুদ্ধার করেছে। সেই মহান নেতা—বীর মুজাহিদ ও দীনের অতন্দ্র প্রহরী সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবি রাহিমাহুল্লাহ,[২৭] আর সেই শক্তিশালী পথটি হলো, ইসলাম ও

---

২৬. খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা মুসলিমদের থেকে 'বায়তুল মাকদিস' ৪৯২ হিজরিতে ছিনিয়ে নিয়েছে। ৪৯২ হিজরির ২৩ শাবান জুমার দিন ফ্রান্সের কুখ্যাত সন্ত্রাসী বাহিনী আল কুদসকে দখল করে নেয়। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তারা তার মধ্যে ৬০ হাজারের বেশি মুসলিমকে হত্যা করেছিল। তারা মুসলিমদের ঘরে প্রবেশ করে হত্যা করেছিল। [হাফিজ ইবনু কাসির রাহি., *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১২/১৫৬]

তারপর মুসলিমরা ৫৮৩ হিজরিতে সেই ক্রুসেডারদের থেকে আল কুদস ছিনিয়ে নেয়। আল্লামা সুয়ুতি রাহি. বলেন, 'সে সময় অনেক বিজয়াভিযান চলছিল। সুলতান সালাহ উদ্দিন আইউবি রাহি. তৎকালীন শাম বা সিরিয়া যা ফ্রান্সের অধীনে ছিল তার সিংহভাগ জায়গাই পুনরায় দখল করে নেন। বায়তুল মাকদিসকেও তিনি দখল করে নেন। বায়তুল মাকদিস ফ্রান্সের হাতে মোট ৯১ বছর ছিল। ফ্রান্স-সরকার তার ক্ষমতায় থাকাকালীন যেসব নিদর্শন রেখে গিয়েছিল ও গির্জা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এসবই সুলতান ধ্বংস করে দেন। গির্জার স্থানে তিনি শাফেয়ি মতাদর্শের একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন। [*তারিখুল খুলাফা*, পৃষ্ঠা : ৫১৯]

২৭. তার আসল নাম সুলতান নাসের সালাহউদ্দিন ইউসুফ ইবনু আইউব। তিনি ইরাকের 'তিকরিত' নামক স্থানে ৫৩২ হিজরিতে জন্মলাভ করেন। পরলোক গমন করেন ৫৮৯ হিজরিতে। তার মোট বয়স ৫৭ বছর। নিজের জীবনের বেশিরভাগ অংশই কাটিয়ে দিয়েছেন জিহাদের পথে। আল্লাহ তাআলা তার হাতে বায়তুল মাকদিস পুনরুদ্ধারে তাকে সম্মানিত করেছেন। সূত্র : *'তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ'*-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'। সুতরাং আমাদেরও উপরিউক্ত পদ্ধতির আলোকেই চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। অতীত-শতাব্দিগুলোতে যেরূপ জিহাদের পতাকা উড্ডীন না করে মুসলিমবিশ্বকে ক্রুসেডার বাহিনীর কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি, ঠিক সেরূপ বর্তমানেও মুসলিমবিশ্বে জেঁকে বসা কাফিরদের কবল থেকে তা জিহাদের মানহাজ [পথ-পদ্ধতি] ছাড়া মুক্ত করা সম্ভব নয়। এজন্য পশ্চিমারা জিহাদের বিরুদ্ধে নানান অপপ্রচার চালিয়ে তা দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে চায়। আর যারা জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেছে তাদেরকে 'জঙ্গি'-'সন্ত্রাসী' তকমা লাগিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া হয়; আর এ ব্যাপারে দেশীয় মুনাফিকরা তাদের সর্বত সহযোগিতা করে। কেননা ইসলামের শত্রুরা ভালো করেই জানে, জিহাদ এমন এক সক্রিয় শক্তি, যা তাদের সব ষড়যন্ত্র ও কুপরিকল্পনা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! এটাই সেই পথ, তোমরা এরই অনুসরণ করো। এর বিপরীতে আমরা যদি ইসলামের অনুমোদিত পথ ছাড়া অন্য পথে চেষ্টা করি, তাহলে আমরাই আমাদের শত্রুদের খেলতামাশা ও ক্রিয়া-কৌতুকের বস্তুতে পরিণত হব, আর আমাদের অবস্থা হবে গাস্‌সাসানার ভাইদের মতো[২৮]।

২৮. অতীতের ইতিহাস। আরবরা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। গাস্‌সাসানা নামে এক ভাগ হয়েছে আর মুনাজারা নামে অপর এক দল বিভক্ত হয়েছে। এ দুটি বিভক্ত মুসলিমদল তখনকার দুটি কাফির পরাশক্তি রোমীয় খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজক পারসীকদের সাথে মিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আরব-মুসলিমদের যে দলটি মুনাজারা নামে বিভক্ত হয়েছে তারা তৎকালীন পারসীয় অগ্নিপূজকদেরকে নিজেদের মিত্রশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। মুনাজারা নামে মুসলিমদলটি তখন ইরাক শাসন করত এবং 'হায়রা'কে নিজেদের রাজধানী বানিয়েছিল। আর গাস্‌সাসানা নামে যে মুসলিমদলটি ছিল, তারা কেবল রোমীয় খ্রিষ্টানদেরকে মিত্র ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নেয় নি; বরং তারা রোমান খ্রিষ্টানদের আস্থাভাজন হওয়া এবং আশির্বাদ পাওয়ার আশায় নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিল। তারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমনদেরকে সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা করত। রোমান খ্রিষ্টানরা সিরিয়ার সীমানায় নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং পাহারাদারির লক্ষ্যে গাস্‌সাসানার মুসলিমদেরকে অপর মুসলিমদল মুনাজারা, যারা পারসীয় অগ্নিপূজকদের মিত্র ও বন্ধু, তাদের অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করত। গোলাম বা দাসরা যেভাবে তাদের নেতাদের আজ্ঞাবহ ও অনুগত হয়ে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

হে মুসলিম উম্মাহ! যদি তোমরা এখনই পবিত্র কুদস নগরী ও মুসলিমদের ভূমি যা জায়নিস্ট ইহুদিরা জবরদখল করে রেখেছে, তা তাদের থেকে মুক্ত না করো, তাহলে মনে রেখো—তারা তোমাদের কঠিন পরিণতির সম্মুখীন

করে ঠিক তদ্রুপ এই নামেমাত্র মুসলিমরাও রোমান খ্রিষ্টানদের অনুগত গোলাম হয়ে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। এক পর্যায়ে এ মুসলিমদল দুটিই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, নিজেদের মধ্যেই নিজেরা কাদা ছুড়াছুড়ি করেছে—তাদের পারসিক ও রোমান প্রভু, নেতা ও মিত্রদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে। মুসলিমরা পরস্পর এ ধরনের ভয়ংকর কার্যক্রম করতেই লাগল। পরিশেষে গাস্‌সাসানা ও মুনাজারা নামে বিভক্ত দুটি মুসলিমদল ক্ষমতা ও নেতৃত্বের বাগডোর থেকে অপসারিত হলো। তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিমিষেই উধাও হয়ে গেল। আজ শুধু তারা অতীতের স্মৃতি। অতীতের ইতিহাস। কিন্তু অপর দিকে একটু লক্ষ্য করুন, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর চিরশত্রু অগ্নিপূজক পারসিক ও খ্রিষ্টীয় রোমানরা আগের অবস্থায় বহাল আছে। তাদের প্রভাব ও শক্তিমত্তা এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। পৃথিবীর নেতৃত্ব ও ক্ষমতার বাগডোর তাদের করতলেই রয়েছে।

উপরে অতীতের মুসলিমজাতির যে বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরা হলো, সেটাই বর্তমান মুসলিমজাতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষত আরব-শাসকরা নিজেদের গদি ও ক্ষমতার বাগডোরকে সংরক্ষণ ও কুক্ষিগত করার লালসায় কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। মুসলিমদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে মিত্রশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। কখনো রাশিয়াকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেয় আবার কখনো আমেরিকাকে মিত্র ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নেয়; কাল্পনিক শত্রুদের শঙ্কায় ও ভয়ে যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

বর্তমান আরব-দেশগুলোর কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমূহ আমাদের পূর্বসূরী গাস্‌সাসানা ও মুনাজারা মুসলিম ভাইদের মতো। যারা নিজেদের ভেতরগত নিরাপত্তাকে সংরক্ষণ করতে পারে নি। তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বহিঃশত্রুশক্তি আমেরিকা, রাশিয়া ও তুর্কিদের সাহায্য তলব করেছে। বাস্তবতা হলো, সেখানে মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কোনো একটি আরব-দেশের উপস্থিতি ছিল না, যে দেশটি মুসলিমদের ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করবে। গোটা আরবজাতি তো বর্তমানে এক শোষিত জাতি। তারা তো শাসক নন।

নাঈম আল-হাশেমি আল-খাফাজি।
লেখক, সাংবাদিক ও ইরাকি।
১৬.৮.২০২০, পত্রিকার নাম : সওতুল ইরাক।

نعيم الهاشمي الخفاجي

করাবে; তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নেবে পবিত্র হারামাইন ভূখণ্ড। আজ বাগদাদ আগামীকাল রিয়াদ। আর এভাবেই চলতে থাকবে, যদি আল্লাহ চান। আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট; তিনি কতই-না উত্তম অভিভাবক!

হে মুসলিম উম্মাহ! বর্তমানে এ কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুসলিমদের বের হওয়ার উপায় কী, কোন মানহাজ [পদ্ধতি] গ্রহণ করলে তারা ফিরে পাবে শান্তি ও নিরাপত্তা?

হে মুসলিম উম্মাহ! তোমাদের স্মরণ থাকার কথা, মুসলিম উম্মাহ বিগত যুগ-কালে পারস্পরিক সহযোগিতা-বন্ধনে আবদ্ধ এই ক্রুসেডার ও জায়নিস্টদের বাগডোর থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য বহুবার চেষ্টা-সাধনা করেছে; দীর্ঘ দৌড়ঝাঁপ করেছে—প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের অধীনে মানবরচিত বিভিন্ন ধর্ম তথা জাতীয়তাবাদ[২৯], সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম[৩০],

২৯. **শাইখ শহিদ আবদুল্লাহ আযযাম রাহি.** বলেন, 'আরব ও অনারব যে জাতীয়তাবাদ হোক, যে-কেউ জাতীয়তাবাদের মূলনীতিগুলোকে গ্রহণ করবে অথবা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হবে যেমন : কুর্দি, ইরানি ও ইরাকি ইত্যাদি তাহলে এটা এমন কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়; অর্থাৎ সে মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে। যে জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী হবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তার জবাইকৃত প্রাণী ভক্ষণ করা যাবে না। কোনো জাতীয়তাবাদী মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না। জাতীয়তাবাদী কোনো পুরুষ মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে না। তাকে গোসল ও কাফন দেয়া হবে না, তার নামাজ পড়া হবে না এবং তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না। তার সালামের উত্তর দেয়া যাবে না। সে তার মুসলিম পিতা থেকে কোনো সম্পদ পাবে না। তার সন্তানরা যদি মুসলিম হয়ে থাকে তারা তার থেকে ওয়ারিস পাবে না ..। কতক মানুষ প্রশ্ন করে, তাদের কেউ কেউ তো কখনো কখনো নামাজ পড়ে, রোজা রাখে? আমি বলি, নামাজ ও রোজা নষ্ট আকিদা-বিশ্বাস ও শিরক-কুফরকে প্রতিরোধ করতে পারে না। অন্যরা বলে, যারা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তাদের অন্তরে কী আছে তা জানা নেই, তাহলে কীভাবে তাদের ওপর এ বিধান প্রয়োগ করা হবে? আমি বলি, আমরা গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান জানি না। আমরা তো ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বিধান প্রয়োগ করব। তাদের মুখ দিয়ে যা বের হবে আমরা সেটা বিবেচনা করব। আর অন্তরের অবস্থা আমরা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করব। সাধারণ নীতি হলো, জাতীয়তাবাদীরা কাফির। তবে কারো ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে তার ওপর এ বিধান প্রয়োগ হবে না। তৃতীয় এক দল প্রশ্ন করে, তাদের অধিকাংশই তো শরয়ি বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ? আমি বলব, জাহেল বা মূর্খ ব্যক্তি যখন জানে এবং তার কাছে বিধান বর্ণনা করার পরও তার ওপর অটল থাকে, তাহলে তার ক্ষেত্রে কুফরের

গণতন্ত্র[৩১] ইত্যাদির পেছনে; কিন্তু তারা কি তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে? পেরেছে কি ফিলিস্তিনকে জায়নিস্টদের দখলদারি ও বলয় থেকে

বিধান লাগানো হবে। সুতরাং কতক আলিম জাতীয়তাবাদ এবং 'জাতীয়তাবাদীরা কাফির' এ সম্পর্কে কিতাব রচনা করেছেন, তাই এতটুকুই 'তাবলিগের' জন্য যথেষ্ট। তাই এখন বর্ণনা করার পর তাদের জাহালত-মূর্খতা ওজর হিসেবে বাকি থাকবে না।

[كتاب؛ القومية العربية/ للشيخ عبد الله عزام].

৩০. শাইখ শহিদ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রাহি. বলেন, 'কমিউনিজম বা সাম্যবাদ এমন একটি মতাদর্শ, মতবাদ ও ধর্ম যা পৃথিবীর যত সবধর্মের সাথে সংঘাতপূর্ণ। আর এর শীর্ষে রয়েছে ইসলাম। কমিউনিজম ধর্মে দীক্ষিত কতক ব্যক্তির কিছু উক্তি। কাল মার্কস ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছে, 'ধর্ম আফিমের মতো' বা গোত্রীয় আফিমের মতো। সে আরো বলেছে, 'আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করে নি; বরং মানুষই আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে'। লেলিন বলেছে, 'ধর্ম হলো কুসংস্কার, কল্পকাহিনী ও মূর্খতা'। স্টালিন বলেছে, 'ধর্মের সারমর্ম হলো, ধর্ম কুসংস্কার; আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করা অলীক-কল্পকাহিনী আর আমাদের মতাদর্শ ও ধর্ম নাস্তিকতা ও ধর্মত্যাগ'। পূর্বোক্ত কমিউনিজম ও কমিউনিজম মতাদর্শের ব্যক্তিদের আলোচনার ভিত্তিতে আমি বলি, 'প্রত্যেক কমিউনিজম ও সাম্যবাদী ব্যক্তি কাফির ও মুরতাদ, যদিও সে সর্বদা বা মাঝে মাঝে নামাজ পড়ে। তার জবাইকৃত প্রাণী ভক্ষণ করা যাবে না। কোনো সাম্যবাদী মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না। কমিউনিজম বা সাম্যবাদী কোনো পুরুষ মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে না। তাকে গোসল ও কাফন দেয়া যাবে না, তার নামাজ পড়া হবে না এবং তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না। তার সালামের উত্তর দেয়া যাবে না। সে তার মুসলিম পিতা থেকে কোনো সম্পদ পাবে না। তার সন্তানরা যদি মুসলিম হয়ে থাকে তারা তার থেকে ওয়ারিস পাবে না।'

[أنظر فتاوى عن الشيوعية للشيخ عبد الحليم محمود]) [كتاب؛ السرطان الأحمر/للشيخ عبد الله عزام].

৩১. الديمقراطية শব্দটি আরবি নয়; বরং ইউনানি শব্দ। শব্দটির অর্থ, জনগণের শাসন বা জনগণের ক্ষমতা অথবা জনগণ-কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা। গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ। কুফরি মতবাদ হওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে। গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য হলো, দেশ পরিচালিত হবে জনগণের কথায় এবং সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। (নাউজুবিল্লাহ) অথচ কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য হলো, পৃথিবীতে বিধান ও ক্ষমতা চলবে একমাত্র আল্লাহর। গণতন্ত্র যে একটি কুফরি মতবাদ তা সকলের কাছেই স্পষ্ট। সুতরাং যে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হবে বা গণতন্ত্রকে নিজের আদর্শ মনে করবে

স্বাধীন করতে? কিন্তু সবশেষে ফলাফল দাঁড়িয়েছে—তারা আমেরিকার নেতৃত্বে সেই কুখ্যাত জায়নবাদী ইহুদিদের সাথে মৈত্রীবদ্ধ হয়েছে। কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের এ ধরনের কার্যক্রম দেখে আসছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ। এর ওপরই তারা বড় হয়েছে। মুসলিমজাতির পরবর্তী প্রজন্ম তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনি মুসলিমদের স্বাধীন করার জন্য, তাদেরকে সুখময় জীবন উপহার দেয়ার জন্য জিহাদের পরিবর্তে এসব তন্ত্রমন্ত্রের পিছনে সময় ব্যয় করার অর্থই হলো—পানির আশায় মরুভূমির মরীচিকার পেছনে দৌড়ঝাপ করা।

হে মুসলিম উম্মাহ! মুসলিম উম্মাহর এ ক্রান্তিলগ্নে ও কঠিন দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে কতিপয় সংশোধনকে এ আহ্বান করতে শুনা যায় যে, ক্রুসেডার ও জায়নবাদীদের ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; কিন্তু উত্থাপিত হয় বাস্তবসম্মত একটি প্রশ্ন মুসলিমবিশ্বের শাসকরা কি এ ওয়াজিব দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত? তারা কি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে কাফিরদের বিরুদ্ধে বাস্তবসম্মত প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রস্তুত? তারা কি প্রস্তুত দৃপ্তকণ্ঠে কাফিরদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিতে?

এখন আমরা ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করব। মুসলিমবিশ্বের শাসকরা মুসলিমদের স্বার্থে কাজ করে না-কি কাফিরদের স্বার্থরক্ষার্থে? তারা কি কাফিরদের বন্ধু না-কি মুসলিমদের?

প্রথম পয়েন্ট : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মুসলিমদের চিরশত্রু ক্রুসেডারদের ব্যাপারে মুসলিম-দেশগুলোর শাসকবৃন্দের অবস্থান।

যখন ক্রুসেডাররা মুসলিমবিশ্বের ওপর আক্রমণ ও উসমানি খেলাফত ধ্বংসের ইচ্ছা করল, তখনকার মুসলিম-নামধারী শাসকরা উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং মুসলিমসংঘবদ্ধ দলগুলোকে

অথবা গণতন্ত্র রক্ষার মিশন নিয়ে চলবে, সে কাফির ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। সূত্র : '*তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ*'-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করে দিল। এমনকি উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রুসেডারদেরকে এই নামধারী মুসলিম শাসক ও তাদের গোলামরা রণাঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। পরিশেষে এক পর্যায়ে হয়ে যায় উসমানি খেলাফত ধ্বংস। পরে ইসলামের চিরশত্রুরা এই উসমানি খেলাফতকে পঞ্চাশেরও অধিক দেশে বিভক্ত করে। আর এই বিশ্বাসঘাতকতায় সর্বাধিক হীন-নির্লজ্জ ভূমিকা রাখে, বাদশাহ আবদুল আজিজ আলে সাউদ, শরিফ হুসাইন এবং তাদের পরিবার।

দ্বিতীয় পয়েন্ট : মুসলিমদেশ ফিলিস্তিন-প্রসঙ্গ

এই নামধারী মুসলিম শাসকরা (আরব-শাসকরা) নয় দশক আগ থেকেই ফিলিস্তিন-ভূখণ্ডে ইহুদিদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইংরেজদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এরপরই ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ওপর নেমে আসে লাঞ্ছনা-অপদস্থতার জীবন। এরপরও ফিলিস্তিনের মুসলিমদের সাথে করা হয়েছে বারবার প্রতারণা; যাতে তারা অস্ত্র ছেড়ে দেয়; অস্ত্রহারা হয়ে যায়। আর এ-ক্ষেত্রেও সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ অবদান রাখে, বাদশাহ আবদুল আজিজ আলে সাউদ। ফিলিস্তিন-ভূখণ্ড বিভক্ত করা এবং সেখানে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত সংবাদ একটি ইহুদি সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়, তখন আরব-দেশগুলো তাদের কোনো বিরোধিতা করে নি; বরং তারা ইহুদি সংস্থার সদস্য হিসেবে বহাল থাকে এবং এখনো আছে। তারা এর বিরুদ্ধে কার্যকরী কোনো পদক্ষেপই নেয় নি। তবে এতটুকু করেছে যে, কাপুরুষ ব্যক্তিদের মতো একটু মৌখিক নিন্দা করেছে মাত্র। অতঃপর বিভক্তি-সিদ্ধান্তের এক বছর পর যখন সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকেই যুদ্ধের লেলিহান শিখা আরো প্রকটভাবে জ্বলে ওঠল। বেশি দিন যেতে না-যেতেই আরব-শাসকরা আমেরিকার এক হুকুমের গোলাম হয়ে আরেকটি সাময়িক চুক্তির ওপর একাত্মতা পোষণ করে। এভাবেই তারা ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনি মুসলিমদের নিয়ে একের পর এক ষড়যন্ত্র করেই যাচ্ছে।

তারপর মাদ্রিদ-সম্মেলন[৩২] এবং এরপর আগত আরো বিভিন্ন সম্মেলনের ছত্রছায়ায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র চলতেই

৩২. মাদ্রিদ স্পেনের রাজধানী এবং অন্যতম বড় শহর। মাদ্রিদে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানান ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালের ৩০

থাকল। ঠিক তেমনিভাবে ইহুদি ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের প্রথম আন্দোলনকে নিঃশেষ করার জন্য চলতে থাকল লাগাতার প্রচেষ্টা। অতঃপর শারোমুশ শাইখ[৩৩] সম্মেলনকে কেন্দ্র করে একই ইতিহাসের পূনরাবৃত্তি ঘটে—ফিলিস্তিনের অসহায়-দুর্বল মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সমর্থন দেয়ার লক্ষ্যে। আর শারোমুশ শাইখ-সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৪১৬ হিজরি-মোতাবেক ১৯৯৬ সালে। অতঃপর আবার বৈরুত-সম্মেলনের ছত্রছায়ায় সেই একই চক্রান্তের পুনরাবৃত্তি ঘটে। বৈরুত-সম্মেলনে মুসলিমভূখণ্ড ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দেয়া হয়। আর কুখ্যাত সন্ত্রাসী ইহুদিরা পর্যায়ক্রমে ফিলিস্তিন-ভূখণ্ডের সিংহভাগ জায়গা জোরপূর্বক দখল করে নেয়। পরিশেষে তারা ফিলিস্তিন-ভূখণ্ডের মানচিত্র পরিবর্তন এবং ফিলিস্তিনকে ওয়ার্ল্ডম্যাপ থেকে সরিয়ে দেয়ার মতো চরম ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়; কিন্তু বাস্তবতা ও ইতিহাস সাক্ষী যে, ফিলিস্তিনের যে ভূমি ইহুদিরা দখল করে নিয়েছে তার কিঞ্চিৎ পরিমাণও বিগত নয়-শতাব্দিতেও নামধারী মুসলিম নেতারা তাদের থেকে উদ্ধার করতে পারে

অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর, এ সময়টাতে ইজরাইল ও মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্পেনের মাদ্রিদ রাজধানীতে মাদ্রিদ-সম্মেলন নামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর এ সম্মেলন আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের তত্ত্বধানে সংঘটিত হয়েছিল।সূত্র : আল-জাজিরা। [২১৩/৩/২০১৬ আরবি পত্রিকা : *আল বাসসুল হাই*।]

৩৩. শারোমুশ শাইখ মিসরের অন্যতম একটি শহরের নাম। এই প্রধান নগরীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ১৯৯৬ সালের ১৩ মার্চ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সম্মেলনটি 'শারোমুশ শাইখ' সম্মেলন নামে প্রসিদ্ধ। এ সম্মেলনটি তৎকালীন মিসরের প্রেসিডেন্ট হুসনি মুবারক ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হয়েছিল। শারোমুশ শাইখ সম্মেলনে দুই প্রধান দেশ, আমেরিকা ও রাশিয়ার পাশাপাশি বিশ্বের ২৯টি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিল। ইজরাইল ও ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিরা সরাসরি সেখানে উপস্থিত ছিল এবং আরব-দেশগুলোর মধ্য হতে ১২টি দেশের প্রতিনিধিরাও ছিল। এরা প্রধান তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ সম্মেলনে উপস্থিতি হয়েছিল। এক. মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। দুই. মিনতাকা তথা স্থানীয় এলাকাগুলোতে পূর্ণ নিরাপত্তা বাস্তবায়ন করা। তিন. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মোকাবিলা করা।

নি। তারা শুধু হতাশ ও নিরাশই হয়েছে। অপর দিকে আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদিন, যারা কাফিরদের বিরুদ্ধে শহিদি বা আত্মঘাতী হামলা করে, তাদের ব্যাপারে মুসলিমদেশগুলোর শাসকদের অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করুন। মুজাহিদরা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমন কাফির-বেঈমানদের বিরুদ্ধে এ ধরনের হামলা ও অপারেশন পরিচালনা করে মুসলিম শাসকদের পক্ষ থেকে ভালো কিছু একটা আশা করেছিল। সাহায্য-সহযোগিতা বা সমর্থন প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু তারা এর বিপরীতে নিয়ে এসেছে অকল্যাণ। মুজাহিদদের তারা শুধু নিন্দা-সমালোচনা এবং প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয় নি; বরং তারা গ্রহণ করে এর থেকে আরো ভয়ংকর পদক্ষেপ। তারা মুজাহিদদের কারারুদ্ধ করে অকল্পনীয় শাস্তি দেয়; গা শিউরে ওঠে যার শ্রবণ-অবলোকনে।

হে মুসলিম উম্মাহ! তোমরা ফিলিস্তিনে আমাদের বিধবা বোনের প্রতি একটু চিন্তা করো, যাদের স্বামী-প্রিয়তমকে জায়নবাদী কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে। ফিলিস্তিনের মুসলিমরা সন্তানদেরকে মুসলিম উম্মাহর হিফাজতের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের পথে সওদা করে দিয়েছে, আর অপর দিকে জায়নিস্ট ইহুদি সন্ত্রাসী সৈন্যরা পবিত্র ভূমিতে সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলা করে চলছে। প্রতিনিয়তই তারা ফিলিস্তিনের মুসলিমদের কষ্টের ফসল ও ফল-ফলাদি এবং গবাদি পশু বিনষ্ট করে দিচ্ছে। অতঃপর সেই কষ্টার্জিত ফসলাদি এবং মূল্যবান সামগ্রী তারা ফিলিস্তিনের অসহায় মুসলিমদের বাড়ি থেকে জোরপূর্বক বের করে রাস্তায় এমনভাবে পিষে ফেলছে যে, তা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ছে। তাদের সম্মুখে সেগুলো রাস্তা, পথ-ঘাটে উড়তে দেখা যায়। আর অপরদিকে এ ধরনের বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আমার অসহায় মুসলিম মা-বোনদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। অঝোর ধারায় তাদের চক্ষুযুগল থেকে প্রবাহিত হতে থাকে চাপা কান্নার আওয়াজ। কিন্তু আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ যে, হারামাইন এবং আরো কিছু স্থানের কিছু মানুষ তাদের জাকাত-সম্পদ এই এতিম ও অসহায় বিধবাদের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। এর দ্বারা তারা দুঃখ-কষ্টে ঘেরা মুসলিম ভাই-বোনদের কষ্ট কিছুটা লাঘবের চেষ্টা করেছে। অথচ আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, ফিলিস্তিনের অসহায়-অবলা মুসলিম মা-বোনদের প্রতি যারা দয়া-অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—দাম্ভিক-পাষাণমনা মুসলিম-নামধারী আমির, সৌদি-বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ তাদের এ মহৎ কর্মে নিষেধাজ্ঞা

জারি করেছে। তার এই নিষেধাজ্ঞায় এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায় সাহায্যের সব কার্যক্রম। কেমন পাষাণমনা হলে এমন নিকৃষ্ট কাজের ফরমান জারি করতে পারে! আসলে এটা কি কোনো মানুষের মন না পাষাণ!! তাছাড়া এটা কতই-না এক নিকৃষ্ট-তুচ্ছ কর্ম যে, কতক এতিম-অসহায় ও বিধবাদের কাছে যে সামান্য সম্পদ পৌঁছানো হচ্ছে, সে আগাগোড়া এর অনুসন্ধ্যান করছে, পর্যবেক্ষণ করছে! সুতরাং এ ধরনের পাষাণমনা ব্যক্তিদের কাছ থেকে কীভাবে কল্যাণ আশা করা যায়? কীভাবে আশা করা যায় যে, এরা দেশ ও দশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে? এত কিছুর পরও দিনার-দিরহামের গোলাম মুনাফিকরা ধারণা করে আর বুলি আওড়ায় যে, এরাই হলো আমাদের আমির-অভিভাবক; আর এরাই আমাদের পক্ষ থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবে; নিশ্চিত করবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা!!

সংশোধন এবং সঠিক পথের কতক আহ্বায়কের কথা বড়ই আশ্চর্যজনক মনে হয়। তারা বলে, মুসলিম উম্মাহর সংশোধন, সংকটময় এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি, মুসলিম-দেশগুলোর নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং সমগ্র মুসলিমজাতির নিরাপত্তা বাস্তবায়ন হবে মুসলিম-দেশগুলোর মুসলিম-নামধারী মুরতাদ শাসকদের আনুগত্যের মাধ্যমে[৩৪], তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে!

সংশোধন ও সঠিক পথের আহ্বানকারী ব্যক্তিদের লক্ষ করে বলব, যদি আল্লাহর রাস্তায় কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করার তোমাদের গ্রহণযোগ্য

৩৪. শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি রাহি. বলেন, 'আগেরকার লোকেরা তাতারী জাতির জুলুম-অত্যাচার ও বর্বরতার দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকে। আচ্ছা বলুন তো, তাতারী জাতির জুলুম-অত্যাচার কি ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের জুলুম-অত্যাচারের সমপরিমাণ হবে? ইসলামিক পুরো ইতিহাসে মুসলিমদের সাথে কাফিরদের জুলুম-অত্যাচারের পরিমাণ কি লিবিয়ার গাদ্দাফির জুলুম-অত্যাচারের সমপরিমাণ হবে? কুখ্যাত ইহুদি জাতির খুন-খারাবি কি বাদশাহ হুসাইনের খারাবির সমপরিমাণ হবে? লেবাননে খ্রিষ্টানদের শাসন কি সিরিয়ায় নুসাইরিদের শাসনের সমপরিমাণ হবে? মানবতার ইতিহাসে এমন কোনো শাসন অতিবাহিত হয়েছে কি যা সৌদি পরিবারের শাসনের মতো হবে? বাস্তবতা হলো, তাতে শাসক ও শাসিতদের মাঝে কোনো অঙ্গিকার নেই। শাসকরা সবকিছুরই মালিক আর শাসিতরা তাদের গোলাম হয়ে বসবাস করছে!!!

[بين منهجين : ٩١].

কোনো ওজর বা কারণ থাকে তাহলে তোমাদের কর্তব্য হলো, নিরবতা অবলম্বন করা। আর গ্রহণযোগ্য কোনো ওজর থাকা তো কখনোই এ ধরনের মুসলিম-নামধারী জালিম-মুরতাদ শাসকদের পক্ষাবলম্বন করা, তাদের তোষামোদ করা এবং তাদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার বৈধতা দেয় না। আর যদি তোমরা এমনটা করোই তাহলে তোমরা এর বিনিময়ে নিজেদের পাপের বোঝা তো বহন করবেই, পাশাপাশি তাদের পাপের বোঝাও বহন করবে যাদেরকে তোমরা পথভ্রষ্ট করেছ। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হলো, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে এবং সমগ্র মুসলিমজাতির ব্যাপারে এক আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাগুতদের প্রতি তোমাদের নম্র সুরের কথন ও তোষামোদ থেকে অমুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۝ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۝﴾

'(হে নবী!) আপনি মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অনুসরণ করবেন না। তারা চায় যে, আপনি নমনীয় হোন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।' [সূরা নুন, আয়াত : ৮-৯।]

আর অসৎ পথের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করার চেয়ে সত্যপথের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করা অধিক উত্তম ও কল্যাণকর।

তৃতীয় পয়েন্ট : আরব-উপসাগরীয় দেশগুলোর বাহ্যিক অবস্থা ও বর্ণনার দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায় যে, তারা ইরাকি বাহিনীর মোকাবিলা করা থেকে অক্ষম হয়ে পড়েছে বা পরাজয় বরণ করেছে। ইরাকি বাহিনী খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের কাছে সাহায্য চেয়েছে। আর ক্রুসেডারদের মোড়ল ও নেতৃত্বদানকারী তো আমেরিকা, যা সকলেরই জানা। তাহলে কীভাবে এই আরব-উপসাগরীয় দেশগুলো আমেরিকা ও ইরাকি বাহিনীর (যারা আমেরিকার শক্তি ও কর্তৃত্বে সৈন্য সংগ্রহ করছে) সামনে টিকে থাকবে?

কুয়েতের তৎকালীন আমির জাবের আস সাবাহ এবং তার সঙ্গীরা কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাক-যুদ্ধের সময় নেয়া সিদ্ধান্তটি ছিল একটি শ্রেষ্ঠ-চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আর এ সিদ্ধান্তই আরব-উপসাগরীয় দেশগুলো গ্রহণ করে নিয়েছে— যতক্ষণ না উপসাগরীয় সব দেশ ও আমেরিকার মাঝে এ কথা ও শর্তের

বোঝাপড়া হয়েছে যে, 'তারা তথা দখলদার বাহিনী কুয়েতকে আপন অবস্থায় রেখে দেবে, দখলদার বাহিনী জনসাধারণের সাথে যে প্রতারণা করেছে এবং আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশে যেসব কাজ করেছে, এর দিকে দৃষ্টিপাত করা হবে না, দখলদার বাহিনী এ অঙ্গীকারও দিয়েছে যে, তারা কুয়েতের পেট্রোল ও রাজস্ব তলব করবে না।'

উপরে বর্ণিত বক্তব্যে নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, এসব নামধারী মুসলিম শাসকরা মানসিকভাবে কতটা বিপর্যস্ত ছিল, দখলদার বাহিনীর সামনে কতটা নমনীয় ছিল এবং দখলদারদের সামনে তাদের আচরণ কেমন ছিল?!

উল্লিখিত কথার সারমর্ম হলো, এসব মুসলিম-নামধারী শাসকরা বস্তুত আমেরিকাকে শক্তিশালী করেছে এবং একটি আরব-দেশে হামলা করার ব্যাপারে তাকে সহায়তা করেছে। এসব মুসলিম-নামধারী শাসকদের ও আমেরিকার মধ্যকার যৌথ প্রতিরক্ষা-চুক্তিটি তারা আমেরিকার সেই আরব-দেশটিতে আক্রমণ করার কয়েকদিন পূর্বে নবায়ন ও জোরদার করেছে। তারপর সকলে মিলে সেই অঙ্গিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। সুতরাং এসব কার্যক্রম ও আচরণ মুসলিমজাতির সিয়াসাত বা রাজনৈতিক বিষয়াবলির ব্যাপারে আমাদের নামধারী মুসলিম শাসকদের অবস্থান পরিষ্কার করে দেয়; প্রকাশ করে দেয় ইসলাম ও মুসলিমজাতির ব্যাপারে তাদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি; উন্মোচন করে দেয় তাদের প্রকৃত মুখোশ। পাশাপাশি কাফিরদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণরীতিও প্রকাশিত হলো।

চতুর্থ পয়েন্ট : ইরাকের ওপর আক্রমণ; শক্তি কিংবা সেনাবাহিনী দিয়ে পুরো বিশ্বের ক্রুসেডারদের মোড়ল আমেরিকাকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে আরব-দেশগুলো চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে। একবার প্রত্যাখ্যান করেছে আমেরিকার সহযোগিতাবার্তা; আরেকবার আমেরিকার সাথে ইরাক-হামলায় একাত্মতা পোষণ করেছে। অতঃপর তারা আবার ফিরে এসেছে প্রথম সিদ্ধান্তে। বাস্তবতা হলো, প্রাথমিক পর্যায়ে আরব-দেশগুলো আমেরিকার প্রস্তাবে একাত্মতা পোষণ না করাটা ছিল, আপন অভ্যন্তরীণ স্বার্থে; কিন্তু পরিশেষে তারা আমেরিকার সামনে আত্মসমর্পণ করেছে; আমেরিকার চাপে তারা নতি স্বীকার করেছে[৩৫]। তারা মার্কিন বাহিনীর জন্য

شروط الإكراه ٣٥

قال ابن حجر : شروط الإكراه أربعة :

(١) أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار.

(٢) أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.

(٣) أن يكون ما هدد به فورياً، فلو قال : إن لم تفعل كذا ضربتك غداً لا يعد مكرهاً. ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً، أو جرت العادة بأنه لا يخلف.

(٤) أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره.

ইকরাহ তথা বাধ্য হওয়ার শর্তাবলি—

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহি. '*ফাতহুল বারি*' কিতাবের 'কিতাবুল ইকরাহ'তে লিখেন :

ইকরাহের অধ্যায়, ইকরাহ্ [বাধ্য করা] বলা হয় অন্যের ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয়া, যা সে চাচ্ছে না। ইকরাহ্ সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত চারটি :

১. মুকরিহ [বাধ্যকারী] যা করার হুমকি দিচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া এবং মুকরাহ [বাধ্য ব্যক্তি] তা প্রতিহত করতে অক্ষম হওয়া, চাই তা পলায়ন করার মাধ্যমেই হোক না কেন।

২. মুকরাহের [বাধ্য ব্যক্তির] প্রবল ধারণা হওয়া যে, যদি সে কাজটি করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে মুকরিহ তার প্রদান করা হুমকি বাস্তবায়ন করবে।

৩. যা করার হুমকি দিচ্ছে তা তাৎক্ষণিক হতে হবে। যদি এমন বলে, তুমি যদি এ কাজটি না করো, তাহলে তোমাকে আগামীকাল প্রহার করব, তা 'বাধ্য হওয়া' হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। তবে ইকরাহ্ হিসেবে ধর্তব্য হবে যদি খুবই নিকটবর্তী সময়ের কথা উল্লেখ করে বা সকলেই জানে, সে যা বলে তা করেই ছাড়ে।

৪. আদিষ্ট ব্যক্তির অন্যায় কাজটি স্বেচ্ছায় করার কোনো প্রমাণ না থাকতে হবে।

সম্মানিত পাঠক! একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন তো, উপরে যেসব মুসলিম শাসকদের কথা বলা হলো তাদের ক্ষেত্রে 'ইকরাহ'-এর শর্তগুলো পাওয়া যায় কি-না। কুরআন-সুন্নাহ ও আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের বক্তব্যের আলোকে নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি সমস্যার সমাধান করুন। আল্লাহ সকলকে সরল পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বি.দ্র. কোনো কোনো বন্ধু এ ধরনের শাসক ও বিচারকদের ব্যাপারে বলতে পারেন যে, তারা যা কিছু করছে, তা তারা ইচ্ছে করে করছে না; বরং তারা ভুলক্রমে করছে বা অজ্ঞতাবশত এবং না জেনে করছে।

জলপথ, স্থলপথ ও আকাশপথ খুলে দিয়ে ইরাকের ওপর হামলার ব্যাপারে তাদের সাথে শরিক হয়েছিল; রেখেছিল বিরাট অবদান—এ জঘণ্যতম কর্মের কারণে ইসলামি শরিয়া-নির্দেশিত সর্বাধিক ভয়ংকর বিধান তাদের ওপর আরোপিত হওয়া সত্ত্বেও। সেই ভয়ংকর বিধানটি হলো, 'মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতা করার দ্বারা ঈমান চলে যায়; মুরতাদ হয়ে যায়।' **কারণ, ঈমান ভঙের দশটি কারণের অন্যতম হলো, 'মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা।'** তাছাড়া তাদের এ ধরনের অবস্থানটা ছিল মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বড় ধরনের এক খিয়ানত ও প্রতারণা। এর পাশাপাশি আরো যেসব ক্ষতি—

১. তাদের প্রতি জনবিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে।
২. এসব মুসলিম-নামধারী মুরতাদ, বিশ্বাসঘাতক, মুসলিমদের নিরাপত্তাদানে অক্ষম শাসকদের বিরুদ্ধে তৈরি হয়েছে বিদ্রোহ-পরিস্থিতি।

আচ্ছা বন্ধুরা! যারা শাসক ও বিচারকদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করে যে, তারা যা করছে তা তারা ভুলক্রমে করছে বা না জেনে করছে, এ কথাটিকে তো ইসলামি শরিয়ত সমর্থনই করে না, যা আমরা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি। এমনকি কোনো সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও তা সমর্থন করে না। তাদের এ ধরনের দাবি আগাগোড়া পুরোটাই অযৌক্তিক। যারা বিশ্বপ্রতিপালক, স্রষ্টা আল্লাহর শরিয়তকে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা থেকে অপসারণ করেছে, দীন-ইসলামকে যাদুঘরে পাঠিয়েছে, যারা পূর্ণাঙ্গ শরিয়তকে বাস্তবায়ন করতে চায় তাদেরকে জগতের সর্বাধিক নিকৃষ্ট ভাষায় গাল-মন্দ করে এবং এ কারণে তাদের ওপর নেমে আসে দুনিয়ার সর্বাধিক ভয়ংকর শাস্তির স্টীম-রোলার, ইসলামি শরিয়তকে পশ্চাৎগামিতা ও উন্নয়নের যুগের সাথে তালমিলিয়ে চলতে না পারার অভিযোগে অভিযুক্ত করে, আল্লাহপ্রদত্ত আইনের বিপরীতে ফরাসি কুফরি আইন, আমেরিকান কুফরি আইন ও ব্রিটেনের কুফরি আইনকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় প্রতিস্থাপন করে, তাদেরকে কীভাবে 'ভুলকারীদের ও অজ্ঞদের' অন্তর্ভুক্ত করা যায়! তাছাড়া যারা সংবিধান থেকে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বিলুপ্ত করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিস্থাপন করেছে, তারা কি জানে না, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিস্থাপনের জন্য কোন্ আকিদা তারা রহিত করেছে? তারা কি এ বিষয়ে অজ্ঞ? নিকট অতিতে আপনারাই তো প্রত্যক্ষ করেছেন যে, ইসলামি দলগুলো যখন দেশে গুটি কয়েকটি শরয়ি আইন চালু করার জন্য শাসকদের নিকট বারবার দাবি উত্থাপণ করছে, আর শাসকরা তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেছে, এমতাবস্থায় শাসকরা কী প্রত্যাখ্যান করছে, এটা কি তারা জানে না? কোনো বিবেকবান কি এ ধরনের হাস্যকর দাবি মেনে নিতে পারে? আল্লাহ হিফাজত করুন। আমিন।

আর এসব মুসলিম-নামধারী শাসকদের দৃষ্টিতে এর থেকেও ভয়ংকর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বহিঃশক্তির সামরিক আগ্রাসন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে যেন তাদের একনায়কতন্ত্র, এক-স্বায়ত্তশাসনের দরজা বন্ধ না হয়ে যায়। বিশেষত রফিক আল আসারের কথা উল্লেখযোগ্য। সে আমেরিকার দালালি ও মুসলিমজাতির সাথে খিয়ানত ও প্রতারণার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আমেরিকা যখন তাকে ইরানের বিরুদ্ধে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত করার আদেশ করল, সে তা খুব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিল। কারণ, ইরান আমেরিকার গোলামির বেড়ি গলা থেকে অপসারণ করেছিল। তারপর কাফিরদের প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রে পরস্পর মুসলিমদের মাঝে জ্বলতে থাকল যুদ্ধের অগ্নিশিখা। তাদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ-পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, তা আজও পর্যন্ত থামে নি। আর ভবিষ্যতে আরো যে যুদ্ধগুলো তাদের মাঝে সংঘটিত হবে, তা তো হবে পূর্বের এসব কারণকে কেন্দ্র করেই।

আরব-উপসাগরীয় দেশগুলোর রাজারা কি জানে না যে, তারা কাফিরদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আজ অপর মুসলিম-দেশে হামলা করছে, আগামীকাল যে তা তাদেরই ওপর আপতিত হবে? তারা অবশ্যই জানে, ভবিষ্যতে তা তাদের বিরুদ্ধে বাস্তবায়িত হবে। তারা কাফিরদের নির্যাতন-নিপীড়ন ও শত্রুতা বন্ধের লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস বা অধিকার রাখে না; আর কাফিরদের বিরুদ্ধে বস্তুগত শক্তি তথা সামরিক শক্তি বাড়ানো, শক্তি অর্জন করা তো দূরের কথা। কারণ, কাফিররা অনেক আগ থেকেই এসব মুসলিম-নামধারী শাসকদের থেকে গোপনীয়ভাবে এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে যে, তারা তাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোনো সামরিক শক্তি অর্জন করতে পারবে না।

পঞ্চম পয়েন্ট : সামনের এ আলোচনার দ্বারা—সমগ্র মুসলিমজাতির সংকট-সমস্যার ব্যাপারে মুসলিম-নামধারী এসব শাসকদের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, এসব শাসক আমেরিকাকে সাহায্য করে যাচ্ছে। তারা আফগানিস্তানের[৩৬] মুসলিমদের

---

৩৬ . পূর্বে জাতিসংঘ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা গিয়েছে। এখানে মৌলিকভাবে আলোচনা করা হবে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র সর্বমোট কয়টি এবং কোন কোন মুসলিম-দেশ

ওপর হামলার ব্যাপারে ক্রুসেডার আমেরিকাকে সমর্থন দিয়ে রেখেছে বিরাট অবদান। সন্দেহাতীতভাবে এটি ছিল একটি ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতা করা। সুতরাং এ ধরনের কর্ম বড় কুফর, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়[৩৭]।

তার সদস্য, সেগুলোর অন্যতম কয়েকটি দেশের নাম। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র সর্বমোট ১৯৩ টি। নিম্নে কয়েকটি মুসলিম সদস্যরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করা হলো—

আফগানিস্তান, বাহরাইন, বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, জর্দান, কাজাখাস্তান, কুয়েত, কিরগিজিস্তান, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, ওমান, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, সোমালিয়া, সুদান, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান ও ইয়েমেন। সূত্র : *উইকিপিডিয়া।*

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, ন্যাটো-বাহিনীর সদস্যরাষ্ট্র সর্বমোট কয়টি এবং কোনো মুসলিম-দেশ ন্যাটো-বাহিনীর অধীনে আছে কি? ন্যাটো-বাহিনীর সদস্যরাষ্ট্র সর্বমোট ৩০ টি। দুটি মুসলিম-দেশ ন্যাটো জোটের অন্তর্ভুক্ত। এক. তুরস্ক; দুই. আলবেনিয়া। তুরস্ক ন্যাটো-জোটের প্রথম সারির ও অন্যতম এক সদস্য। ন্যাটো-জোট পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অপারেশন চালানোর জন্য তুরস্ক পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ দিয়ে থাকে এবং বিপুল পরিমাণ সৈন্যবাহিনী প্রদান করে থাকে। বলাবাহুল্য যে, এই জাতিসংঘ ও ন্যাটো-জোটই সমগ্র মুসলিমজাতি ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। আফগানিস্তানে এই ন্যাটো-জোট হামলা চালিয়েছে এবং জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহও। আর তাতে অনেক মুসলিম-দেশও ছিল! সূত্র : *উইকিপিডিয়া।*

৩৭. ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিম যেন জেনে রাখে, কাফিরদের পতাকাতলে প্রবেশ করা, তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করা বা তাদেরকে যে-কোনোভাবে সহযোগিতা করা যথা : তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করা বা মুসলিম বাহিনী কাফিরদের জন্য দলিল হওয়া বা তাদেরকে সাহায্য করার নিশ্চয়তা দেয়া বা রসদ সরবরাহ-পথের নিরাপত্তা প্রদান করা বা তাদের জন্য পানাহারের যোগান দেয়া বা খাবার ও পানীয়কে এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা বা তা সহজ করা বা তাদেরকে পাহারা দেয়া বা তথ্য ও সংবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে সাহায্য করা বা প্রত্যেক এমন কাজ যা যুদ্ধের জন্য সহযোগী হয় বা তাদেরকে পরামর্শ দেয়া অথবা তাদেরকে পথের সন্ধ্যান দেয়া, এগুলোর যে-কোনো একটা করার অর্থ হলো, আল্লাহর সাথে কুফরি করা এবং ঈমান ভঙের কারণসমূহের মধ্য হতে কোনো একটাতে পতিত হওয়া। আর এর দ্বারা ব্যক্তি কাফির ও মুরতাদ হয়ে যায় আর এর ওপর সকলেই একমত।'

ষষ্ঠ পয়েন্ট : এমন কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন ও অবস্থা দৃশ্যমান হয়েছে, যা উপসাগরীয় দেশগুলোর[৩৮] অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে দেয়। যখনই কোনো আরব-উপসাগরীয় দেশ মার্কিনি চাপের মুখোমুখি হয় তখনই সে-দেশ মার্কিনিদের হাতে স্থানীয় এলাকার পেট্রোল-খনি সোপর্দ করে দেয়। আর এরই একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত—আরব-উপসাগরীয় দেশগুলোর সম্মিলিত পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন। আর এটাকে 'মুবাদারাতু জায়েদ'[৩৯] নামে

[عن بيان للمشايخ؛ علي الخضير وناصر الفهد وأحمد الخالدي].

৩৮. উপসাগরীয় দেশ সর্বমোট আটটি : বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, লেবানন, সিরিয়া। সূত্র : *বাংলা উইকিপিডিয়া*।

৩৯. 'মুবাদারাতু জায়েদ' সম্মেলনটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রতি জায়েদ আন-নাহিয়ানের উদ্যোগে সংঘটিত হয়েছিল। এজন্য তার নামেই সম্মেলনটি প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে। সে সর্বপ্রথম সাদ্দামকে এ প্রস্তাব পেশ করেছে যে, সে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরে পড়বে এবং নিরাপদ কোনো স্থানে আশ্রয় নেবে আর তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপত্তা দেয়া হবে। আর সে ইরাককে আমেরিকা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের রক্ষণাবেক্ষণে বা জিম্মায় রেখে দেবে। তার এই উদ্যোগকে ঐক্যবদ্ধভাবে আরব-উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো সমর্থন করেছে।

কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামদ ইবনু জাসিম এক সাংবাদিক সম্মেলনে যেখানে উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একত্রিত হয়েছিল সেখানে সে বলেছিল, 'আরব-উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো খুব শক্তভাবে শাইখ জায়েদের উদ্যোগকে সমর্থন ও শক্তিশালী করেছে এবং পাশাপাশি তারা মনে করছে, এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্যোগ। সূত্র : *'তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ'*-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রিয় পাঠক! একটু গভীরভাবে লক্ষ করুন যে, কীভাবে সে মুসলিম উম্মাহর কর্ণধার হয়ে একটি মুসলিম-রাষ্ট্রকে ক্রুসেডারদের মোড়ল আমেরিকার রক্ষণাবেক্ষণে ও জিম্মায় অর্পণ করার প্রস্তাব পেশ করতে পারে!!! তাছাড়া কীভাবে অন্যান্য আরব-রাষ্ট্রগুলো তার এ উদ্যোগকে সমর্থন ও শক্তিশালী করতে পারে! সাদ্দামকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয়েছে। আরব-রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য ও সহযোগিতায় মুসলিম-দেশ ইরাক সমগ্র মানবতা চির দুশমন আমেরিকার হাতে চলে যায়। চরম একটা বাস্তবতা খেয়াল করুন, যত মুসলিম-দেশ আছে এগুলোর সিংহভাগই ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমন কাফিররা নামধারী মুসলিম গাদ্দার, মুরতাদ শাসক ও মুসলিম জনসাধারণের সহযোগিতায় জবরদখল করে নিয়েছে। বাস্তবতা লক্ষ করুন, আমার প্রিয় ভূমি আফগানিস্তানের কথা। যদি তার পাশ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান আমেরিকাকে সাহায্য না করত এবং তাদেরকে ঘাঁটি না দিত, তাহলে কীভাবে তারা আফগানিস্তানে আক্রমণ চালাত? এসব নামধারী শাসকদের সাহায্যেই আফগান-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ইমারাতে ইসলামিয়া ধ্বংস হয়েছে। *অনুবাদক*

নামকরণ করা হয়। আরব-উপসাগরীয় দেশগুলো সাদ্দামের কাছে প্রস্তাব করেছে যে, ইরাক, ইরাকের জনগণ এবং ইরাকের পেট্রোল-খনি নিঃশর্তে তাদের কাছে হস্তান্তর করবে। আর সে ইরাকের মসনদ বা ক্ষমতা থেকে সরে পড়বে। এর বিনিময়ে তারা তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে—এ শর্তে যে, ইরাকে কোনো রক্তপাত করা হবে না। আর ওদিকে বাদশাহ সাউদ আল-ফয়সাল নির্লজ্জভাবে এ নীতি বা সিদ্ধান্তকে বারবার জোরদার করেছে। আর এ সিদ্ধান্তের ফলাফল দাঁড়িয়েছে—যখনই উপসাগরীয় দেশগুলো ইরাকের পেট্রোল-খনি জবরদখল করাকালীন মার্কিনি চাপের মুখোমুখি হয়েছে তখন দ্রুত তারা সেই অবস্থান (চাপের মুখে মার্কিনিদের হাতে তেল-সম্পদ সোপর্দ করে দিয়েছে) বা সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে নিয়েছে। আর এদের অন্যতম ছিল রিয়াদের আমির।

সপ্তম পয়েন্ট : কিছু বাস্তবসম্মত ঘটনা ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, যা ইসলাম ও সমগ্র মুসলিমজাতির শত্রুদের শত্রুতা, ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা প্রতিরোধে আরব-উপসাগরীয় মুসলিম-দেশগুলোর শাসকবৃন্দের অবস্থান ও দৃষ্টিকোণ তুলে ধরবে। বিশেষত অন্যতম আরব-উপসাগরীয় দেশ সৌদি আরবের অবস্থান ও দৃষ্টিকোণ। যখন মার্কিন ট্যাংকগুলো জাজিরাতুল আরব তথা সৌদ আরবের মাটিতে পদার্পণ করল এবং মুসলিম-ভূখণ্ড জবরদখল করতে ক্রুসেডীয় বিমানগুলো সর্বাধুনিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পৌঁছাল তখন উপসাগরীয় দেশগুলোর প্রধান দেশ সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আবদুল আজিজ আলে সাউদ আমেরিকার সম্মুখে নতি স্বীকার করল, বশ্যতা মেনে নিল এবং মুসলিমদেরকে আমেরিকার সামনে মাথানত করা, আত্মসমর্পণ করা ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণে প্রবৃত্ত করল!

সে আরো বলেছে, 'মার্কিন সেনাবাহিনী, যুদ্ধবিমান ও ট্যাংকগুলো যুদ্ধের উদ্দেশে আমাদের দেশে পদার্পণ করে নি!!!'[৪০] হায় লজ্জা, হায় অপমান, লাঞ্ছনা! কবি বলেন—

৪০. আল্লাহর দুশমন ফাহাদ ইবনে আবদুল আজিজ আলে সাউদ ১৪১১ সালের মহর্‌রম মাসের ১৮ তারিখে একটি ভাষণ দিয়েছিল। আর সে-ই 'বিলাদুল হারামাইনে' ক্রুসেড-যুদ্ধের ঘোষণার সূচনা করেছে। সে বলেছে, 'হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা! পূর্বে দুঃখজনক ঘটনা কুয়েতযুদ্ধ গত হয়েছে। ইরাকি বাহিনী সৌদি-সীমান্তে বড় ধরনের সৈন্য সমাবেশ করছে। সৌদি-সরকার দেশ ও জাতির এবং অর্থনৈতিক

'যখন তুমি জানবে না যে, তোমার গগনে বিপদের ঘনঘটা উদয় হয়েছে; এটি একটি সংকট। আর যখন তুমি জানবে না যে, তোমার দুয়ারে বিপদ-হাওয়া বইছে, তাহলে এটি মহা সংকট'।

আলোচ্য কথার সারমর্ম

এই শাসক, যে ইসলামি শরিয়তের কতক বিধানকে বিশ্বাস করে (সবেমাত্র যার আলোচনা গত হলো) সে কখনোই শত্রু-কবলিত মুসলিম-ভূখণ্ড প্রতিরক্ষা করতে পারবে না। আর যে ইসলামি শরিয়তের সব বিধান বিশ্বাস করার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে ঈমানবিধ্বংসী বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত থাকে, কীভাবে তার থেকে মুসলিমজাতি ও মুসলিম-ভূখণ্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কল্যাণের আশা করা যায়!!!

নিশ্চয় যারা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কাফিরগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করে, মুসলিমদের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ বৃথা যেতে দেয়, এমনকি এক পর্যায়ে কাফিরদের সামনে মাথানত করে এরাই দাবি করে যে, তারা তাদের মুসলিম ভাইদের ভালোবাসে, এবং এ বুলি আওড়ায় যে, তারা ইসলাম ও

বিভিন্ন বিষয়ে নিরাপত্তার শঙ্কা অনুভব করছে। এজন্য সৌদি-বাদশাহ নিজেদের আরব-সৈন্যবাহিনীর সাথে অন্য এক বন্ধু বাহিনী যোগ করার ঘোষণা দিয়েছে। তড়িৎ গতিতে আমেরিকা-সরকার আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে যেভাবে ব্রিটেন সরকার সাড়া দিয়েছে এবং আরো অন্যান্য ওইসব দেশ যাদের সাথে সৌদি আরবের খাঁটি বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার বার্তা বা চুক্তি রয়েছে। এরা সৌদি বাহিনীর সাথে একযোগে দেশ ও দশের নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে যে-কোনো শত্রু-বাহিনীকে প্রতিরোধ করবে।

[السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية مائة عام : ص ٧٤٩-٧٥٠].

সম্মানিত পাঠকগণ! একটু বলুন তো, আমেরিকা ও ব্রিটেনের বর্বরতার কথা কার না জানা আছে? তারা কি মুসলিমজাতির রক্ষক না ভক্ষক? এটা কার না জানা আছে? তাহলে কীভাবে মুসলিম-দেশে এই কুখ্যাত জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদেরকে জায়গা দেয়া হলো! আসলে এই নামধারী মুসলিম শাসকরা নিজেদের ক্ষমতা, রাজতন্ত্র, প্রভুদের মন রক্ষা এবং নিজেদের আয়েশি জীবন যেন হারিয়ে না যায়, সেজন্য ইসলাম ও মুসলিমজাতির বিরুদ্ধে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ও ঘৃণ্য আয়োজন। আল্লাহ! তুমি মুসলিমজাতিকে হিফাজত করো এবং এ ধরনের ঈমানবিধ্বংসী কার্যক্রম থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করো। আমিন।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যা করছে তা বাধ্য হয়ে করছে!!! (কোনো সন্দেহ নাই যে, তাদের এই বাধ্য শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত নয়) সৌদি-বাদশাহ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গই আরব-উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরের মাঝে তেল ও খনিজ সম্পদ নিয়ে বিরোধ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মূল নায়ক, মাস্টারমাইন; বরং স্বয়ং সৌদি আরবেও এই নীতি বাস্তবায়ন হয়েছে। যেমন, রিয়াদের শাসক সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় ও মধ্যভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানের তেল ও খনিজ সম্পদ আমেরিকার হাতে ছেড়ে দিয়েছে আর উত্তর এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় কিছু অংশের তেল ও খনিজ সম্পদ ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করেছে। এর বিনিময়ে তারা জিজান[৪১], সামতা[৪২] ও আবু আরিশ[৪৩] ইত্যাদি বিভিন্ন

৪১. জাজন অথবা জিজান সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের জাজন অঞ্চলের প্রধান শহর। এ শহরের উত্তরে রয়েছে ইয়ামেন-সীমান্ত। লোহিত সাগরের উপকূলের বন্দর নগরী জাজন, পেতাশ্রয় ও কৃষি-খামারের জন্য বিখ্যাত। আম, ডুমুর এবং পেঁপের মতো গ্রীষ্মকালীন ফলের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে এ শহরের বিশেষ কদর রয়েছে। সূত্র : *উইকিপিডিয়া*।

৪২. সামতা দক্ষিণ-পশ্চিম সৌদি আরবের জিজান প্রদেশের একটি শহর ও উপ-বিভাগ। সূত্র : *উইকিপিডিয়া* (ইংরেজি)

৪৩. আবু আরিশ দক্ষিণ-পশ্চিম সৌদি আরবের জিজান প্রদেশের একটি শহর। ঐতিহাসিকভাবে আবু আরিশ, এর খামার এবং খাঁটি জলের জন্য সুপরিচিত। আবু আরিশ অঞ্চলটি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এর অবস্থানের কারণে এটি এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক কেন্দ্র। বেশিরভাগ ব্রান্ডের উপস্থিত রয়েছে এখানে। সূত্র : *উইকিপিডিয়া*।

অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সুতরাং যারা বিগত ও বর্তমান শাসকবৃন্দের ইতিহাস ও জীবনদর্শন অধ্যয়ন ও গভীরভাবে চিন্তা করবে, তারা অবশ্যই জানতে ও বুঝতে পারবে, বর্তমান মুসলিমদের অধঃপতন ও দুরাবস্থার জন্য দায়ী একমাত্র এসব নামধারী মুসলিম শাসকরাই। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করে ভয়ংকর ও ঘৃণ্য কাজ থেকে মুক্ত রেখেছেন তার কথা ভিন্ন।

সৌদি-বাদশাহ কার্যতই মুসলিম সন্তানদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি-নীতি অবলম্বন করেছে। সৌদি-বাদশাহ কর্তৃক মুসলিম সন্তানদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা, তাদেরকে কারারুদ্ধ করা, তাদেরকে খারেজি অপবাদ দিয়ে কাফির আখ্যায়িত করা এবং হত্যা করা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে [আমরা তাদেরকে শহিদ মনে করি এবং আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট]। আর এসব কাজ ওই বছর রবিউল আওয়াল মাসে রিয়াদে বোমা-হামলা[৪৪] হওয়ার পূর্বেই সংঘটিত হয়েছে। অথচ এসব নামধারী মুসলিম-শাসক ও ব্যক্তিরা এ বুলি আওড়িয়েছে যে, রিয়াদের বোমা-হামলাকে কেন্দ্র করেই আমরা এ ধরনের অপারেশন পরিচালনা করেছি। তাছাড়া মুসলিম-দেশগুলোতে মুসলিমদেরকে টার্গেট করে যে হামলাগুলো হয়ে থাকে, চাই তা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হোক বা অন্য কোনোভাবে, এসবই ক্রুসেডার-মোড়ল আমেরিকার নির্দেশে তাদের নীল নকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই হয়ে থাকে; যাতে এর বিনিময়ে এসব নামধারী মুসলিমরা আমেরিকার সন্তুষ্টি[৪৫]

করতে পারবে না যতদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনের মুসলিমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না এবং যতদিন সকল ক্রুসেডার-সৈন্য মুহাম্মাদের এ দীপ বা রাষ্ট্র থেকে বের না হবে।

جاء في كتاب؛ "عملية شرق الرياض وحربنا مع أمريكا وعملائها، الفصل الرابع/إصدار مركز الدراسات

৪৫. শাইখ শহিদ ইউসুফ উয়াইরি রাহি. বলেন, 'বাস্তবতা হলো, বর্তমান মুসলিম উম্মাহর উপরে অত্যন্ত কঠিন এক পরিস্থিতি অতিবাহিত হচ্ছে। বর্তমান সমগ্র মুসলিম-বিশ্বের জেলখানায় যত কয়েদি বা বন্দি রয়েছে তাদের সিংহভাগই মুজাহিদরা এবং দীনের ধারক-বাহকরা। কেউ কি সত্যায়ন করবে যে, জিহাদ এমন এক বড় অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে যাকে সরকারিভাবে বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কঠোর হস্তে দমন করা হচ্ছে। এটা কি চিন্তা করা যায় যে, এসব মুসলিম-নামধারী শাসকদের কঠোরতা কোন পর্যায়ে চলে গেছে যে, এরা মুসলিম সন্তানদেরকে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের হাতে

ও ভালোবাসা লাভ করতে পারে। অপর দিকে এসব শাসকই মুসলিম-ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের জায়গা করে দিয়ে মুসলিম তরুণদেরকেই উত্তেজিত করেছে। আর তাদের এ সবকর্মই ইসলাম ধর্মের বিপরীত, মুসলিমদের শাআইর তথা পবিত্র স্থানগুলোর সাথে হাসি-তামাশার নামান্তর এবং হারামাইনের সন্তানদের জন্য চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি এর মাধ্যমে নামধারী মুসলিম-শাসকরা বাস্তবিক অর্থেই মুসলিমজাতির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ না থাকার কারণে এ মাসআলা স্বতন্ত্রভাবে একটি বিশেষ পুস্তিকায় 'বিলাদুল হারামাইন' সম্পর্কে আলোচনা করব। আমি আশাবাদি, আল্লাহ চাহে তো তোমাদের কাছে তা পৌঁছাবে।

কাফিরদের স্বার্থ রক্ষার্থে নামধারী মুসলিম শাসকদের দালালি; পাশাপাশি মুসলিমদের সাথে শত্রুদের কুকুরের ন্যায় আচরণ; মুসলিমদের অবস্থা; এসব শাসক-কর্তৃক আল্লাহর দীনের সাথে খিয়ানত, মুসলিম জনসাধারণের সাথে জুলুম-অত্যাচার এবং আল্লাহর সৈনিক মুজাহিদদেরকে জিহাদ থেকে দূরে রাখা—এসব বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা সংক্ষিপ্তাকারে ফুটে ওঠেছে সামনের এই পঙক্তিমালায়। কবিতাগুলোর সিংহভাগই ড. ইউসুফ আবু হিলালা কর্তৃক রচিত। তিনি বলেন—

'আজ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তো কাফিরদের খেলনা ও ক্রিয়া-কৌতুকে পরিণত হয়েছে;

তুলে দেয়! যদি আপনারা একটু বিস্তারিতভাবে পরিসংখ্যান করেন, মুসলিম-দেশগুলোর কারাগারগুলোতে কারা অবস্থান করছে , তাহলে আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এসব নামধারী মুসলিম শাসকদের প্রধান শত্রুই জিহাদ এবং মুজাহিদিন। যারা সত্য প্রকাশে নির্ভীক তারা আল্লাহর জন্য কোনো নিন্দুকের পরোয়া করে না। আল্লাহর সৈনিক মুজাহিদদেরকে যতই বন্দি রাখা হোক, দেশান্তর করা হোক, যতই কঠিন শাস্তি দেয়া হোক এবং খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেয়া হোক তাদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখা যাবে না। কারণ, জিহাদ একটি প্রাচীন অনুসরণীয় পথ বা পদ্ধতি।

[مستقبل العراق والجزيرة العربية، إعداد مركز الدراسات].

ড. আফিয়া সিদ্দিকি একটি পরিচিত নাম। পাকিস্তানের অধিবাসী। আমাদের প্রিয় বোন। আমেরিকার দালাল মুরতাদ শাসক মুশার্‌রফ আমাদের এ মুসলিম বোনকে তার সন্তানাদিসহ আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে। অপরাধ একটাই সে না-কি জিহাদি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত!

খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা সবাই তাদের নিয়ে খেলা করছে!

মুসলিমদের বাদশাহ এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনা ধ্বংস করে দিচ্ছে মুসলিমজাতিকে;
শাহি মসনদে শাসকরা প্রতিমূর্তি এবং গোশতবিহীন হাড্ডি হয়ে আছে।

আল-কুদস! তোমার প্রতি শত আফসোস, তোমার পবিত্রতা কলঙ্কিত করা হচ্ছে;
আর অপর দিকে মুসলিমরা জিহাদ থেকে হাত ধুয়ে আছে।

বাগদাদ! হে দারুল খিলাফাহ! তোমার প্রতি আফসোস!
তোমার পবিত্রতার কী অবস্থা? নিম্নশ্রেণির লোকগুলো কলুষিত করেছে তোমার পবিত্রতা!

মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত আছে দক্ষ শিকারী, আক্রমণকারী;
ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত আছে খরগোশ ও উটপাখি।

মুসলিমজাতির এমন একটি ঘরও নেই যেখানে তারা মাথা গুজাবে;
আর আমার মাতৃভূমি তো শত্রুরা খাবলে নিয়েছে; অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে।

হে আমার মুসলিমজাতি! আমি একটি পাখি। আমার একটি জঙ্গল আছে;
আমি সেখানে গানের নেশায় মত্ত থাকব আর আমাকে কোনো তিরস্কার করা হবে না! এটা কভু হতে পারে না।

আমি যদি প্রকাশ্যভাবে কোনো বাস্তবতা তুলে ধরি,
এ কারণে কি আমাকে দোষারোপ করা হবে?

রূঢ় বাস্তবতা হলো, আমাদের মুসলিমদের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ,
মুসলিম-নামধারী শাসকবৃন্দ।

প্রত্যেক জিন্দিকের ব্যাপারে দাবি করা হয় যে,
সে মুসলিমদের সেবক ও অনুসরণীয় ব্যক্তি।
মুসলিম-শাসকরা দাবি করে তারা মুসলিমজাতির সাহায্যকারী;
অথচ ঠিক ওই সময়ে তারা আমাদের মৃত্যুব্যাধি।
খ্রিষ্টান ক্রুসেডার বাহিনীর জোয়ার পুরো পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে;
সুতরাং হে মুসলিমজাতি! তোমাদের পরহেজগারি-খোদাভীতি, উদারতা ও
দুঃসাহসী নির্ভীক সৈনিকরা আজ কোথায়?

ইতঃপূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে আমি জোরালো কণ্ঠে বলতে চাই, আজ উন্মোচিত হয়েছে গোটা বিশ্বের মুসলিম-রাষ্ট্রগুলোর চূড়ান্ত অধঃপতন ও ক্ষতির দিক। বিশেষত জাজিরাতুল আরবের। এ কথা তো সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বের মুসলিম-শাসকরা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে নিতান্ত অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। তারা তো ইসলামি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং কাফিরদের আক্রমণ থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা তো দূরের কথা; বরং তারাই তো ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের নীল নকশা ও ষড়যন্ত্রমূলক এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়ন করছে! বাস্তব কথা হলো, মুসলিমবিশ্ব ও মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করার নেপথ্যে তো এরাই।

বর্তমান মুসলিমবিশ্বের শাসকদের বাস্তব অবস্থা নিরীক্ষণের পর আমরা ফিরে যাব—শাসকরা যে কর্মপদ্ধতির ওপর চলছে তার আলোচনায়। [তারা কোন জীবনব্যবস্থার ওপর চলছে এবং মুসলিমজাতিকে কোন জীবনাদর্শের ওপর পরিচালনা করছে, তা জানাটা খুবই জরুরি একটি বিষয়]

বর্তমান মুসলিমবিশ্বের নামধারী মুসলিম-শাসকদের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে যে-কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই কোনো ধরনের চিন্তা-সন্দেহ ছাড়াই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, এসকল শাসক আপন কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করছে; যাপিত করছে মনচাহি জীবন। তারা জীবন চলার পথে আরো লক্ষ করছে, নিজেদের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক স্বার্থ-সুবিধা এবং তাদের ক্রুসেডীয় বন্ধু ও অভিভাবকদের সন্তুষ্টি ও আশির্বাদ। বিশ্ব-মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলামকে আঁকড়ে ধরা, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তাকে বাস্তবায়ন করা তাদের

কর্মপদ্ধতি ও ধর্মে নেই! বরং বাস্তবতা হলো, তারা তাদের মন-চাহিদা অনুপাতে কিতাবের কতক অংশের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে আর তাদের মন-চাহিদার বিপরীত কতক অংশকে অস্বীকার করে। এ কাজটা তারা করেড়নিজেদের ক্ষমতা ও রাজত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। আর এটাই বড় কুফর যা ব্যক্তিকে ধর্ম থেকে বের করে দেয়। নিয়ে যায় কুফরের শিবিরে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝﴾

‘তোমরা কি কিতাবের কতক অংশের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছো আর কতক অংশ অস্বীকার করছো? সুতরাং ভালো করে জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যে এমনটা করবে, তার জন্য দুনিয়ার জীবনে অপেক্ষা করছে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিনতম শাস্তি। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ কিন্তু সে সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন।’ [সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৫।]

এসকল নামধারী মুসলিম-শাসকদের মৌলিক একটি লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং শাহি মসনদের আসনকে আরো পাকাপোক্ত করা। এ ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

বলাবাহুল্য যে, মুসলিম-নামধারী এ শাসকদের সমস্যাটা কোনো শাখাগত সমস্যা নয়; বরং তা মৌলিক পদ্ধতিগত সমস্যা। মানহাজগত মৌলিক সমস্যা। আর এটা তখনই হয়েছে, যখন তাদের জীবনযাত্রার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক নীতিমালা ও নোংরা আকিদা প্রকাশ পেয়েছে। শাসকের নিঃশর্ত আনুগত্য ও কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব, এটা কখনো আল্লাহর দীনের জন্য হতে পারে না; অর্থ্যাৎ কোনো শাসক বা বিচারকের ইবাদত-উপাসনা, এটা কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হতে পারে না। ‘বিচারক বা শাসকদের নিংশর্ত আনুগত্য ও অনুসরণ অবশ্য পালনীয়’ এ ধরনের বুলি আওড়িয়ে বর্তমান মুসলিমবিশ্বের শাসকরা জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত ধোঁকা

দিচ্ছে। যদিও তোমরা মুসলিমবিশ্বের কতক দেশে এগুলোকে ইসলামের ছদ্মবেশে গোপন রাখছো। বিশেষত তাদের এ কাজটা তখন আরো সহজলভ্য হয়েছে, যখন তারা ওলামা ও খতিবদের একটা দল এবং পুরো মিডিয়া-জগৎকে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। এদেরকে নিজেদের বশে আনতে পেরেছে। তারা বহু আগ থেকেই এদেরকে ব্যবহার করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে 'উলুল আমর' তথা 'দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বা অভিভাবকদের অনুসরণে'র যে অর্থ রয়েছে সেটাকে পরিবর্তন করে 'উলুল আমরে'র অর্থকে অনেক ব্যাপক করেছে এবং নিজেদেরকে কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ 'উলুল আমর' হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রচারণা চালিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে এ সকল নামধারী মুসলিম-শাসকরা মূর্তিরূপ ধারণ করেছে; আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয়। যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিলাদুল হারামাইনে। আর যেসব আলিম তাদের বশ্যতা স্বীকার ও তোষামোদ করছে না, তাদের ভাগ্যে জুটছে কারাগারের নির্মম শাস্তি। এক পর্যায়ে তারা বাধ্য হয়েই তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং তাদের গুনোগান গাইতে থাকে।

এজন্যই আরব-দেশগুলোর এই অবস্থা। দিন দিন প্রতিনিয়ত আরব-দেশগুলো পার্থিব-অপার্থিব উভয় দিক থেকেই জীবনযাত্রার প্রতিটি অঙ্গনেই ভয়ংকর অধঃপতনের শিকার হচ্ছে। আরব-দেশগুলোর অধঃপতনের চিত্র এতটুকু আলোচনা দ্বারাই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোনো এক সময় বিশ্বের একটি অংশ থাকা একটি দেশ, সেই একটি মাত্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে বর্তমান আধুনিক কালের আরব-দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক বেশি মন্দা। আর এটা তখনকার ঘটনা যখন মুসলিম উম্মাহ পূর্ণাঙ্গ ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে জীবন চলার পথে বাস্তবিক অর্থেই ধারণ করেছিল। সেই একটি মাত্র দেশ হলো, আমাদের সেই প্রিয় আন্দালুস (স্পেন)[৪৬] আমাদের হারানো ফিরদাউস। আর সেই হারানো আন্দালুস (স্পেন) এখন কাফির রাষ্ট্র বা দারুল হরব। এতদসত্ত্বেও সেই

৪৬. ৯২ হিজরিতে দুঃসাহসী বীর মুজাহিদ তারিক বিন জিয়াদ ও মুসা বিন নুসাইর বিজয় করে। তার ওপরই ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর তা ৮৯৭ হিজরিতে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের হাতে পতন ঘটে। সূত্র : '*তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ*'-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

কাফিরদের অর্থনীতি আমাদের মুসলিমদের অর্থনীতি[৪৭] থেকে কতশত শক্তিশালী ও মজবুত! কারণ, কাফির-রাষ্ট্রগুলোতে শাসকদের হিসেব দেয়ার দায়বদ্ধতা ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আর আমাদের মুসলিম-দেশগুলোতে শাসকদের নেই কোনো হিসেব দেয়ার দায়বদ্ধতা, আর নেই তাদের শাস্তির কোনো ব্যবস্থা। অপর দিকে আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ এ ধরনের স্বার্থবাজ শাসকদের আনুগত্য করছি; করছি তাদের কল্যাণ কামনা!

বলাবাহুল্য যে, আমরা মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে কঠিন এক পরিস্থিতির শিকার; আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে; এর একমাত্র কারণ, আমরা অনেক কিছুই হারিয়েছি। লুপ্ত হয়েছে আমাদের সঠিক বুঝশক্তি; আমাদের জীবনযাত্রা থেকে অপসারিত করেছি দীন-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, মুসলিমদের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। তারা মনে করছে, ইসলাম ধর্ম গুটি কয়েকটি ইবাদত-সমষ্টির নাম। যেমন : নামাজ, রোজা ইত্যাদি; অথচ ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম। মানবজাতির প্রতিটি অঙ্গনে রয়েছে ইসলামি বিধান এবং প্রতিটি সমস্যার

৪৭. স্পেন সরকারের ২০০৪ সালে ১২তম বাৎসরিক বাজেটের পরিমাণ ১০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর অপর দিকে আরব-রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম বড় মুসলিম-রাষ্ট্র সৌদি আরবের একুশতম বাৎসরিক বাজেট ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আনুমানিক প্রায় অর্ধেক কম। অথচ সৌদি আরব যে পরিমাণ আল্লাহপ্রদত্ত প্রাকৃতিক তেল ইত্যাদি বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অধিকারী সে পরিমাণ স্পেনের আয়ত্বে বা অধিকারে নেই। সূত্র : '*তাওজিহাতুন মানহাজিয়্যাহ*'-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

মুসলিম ভাইয়েরা! বাস্তবতা হলো, এসব মুসলিম-নামধারী মুরতাদ শাসকরা মনে করে, এসব সম্পদ এবং জনসাধারণের সম্পদ নিজেদের বাপ-দাদার সম্পদ। এজন্য তারা যেভাবে খুশি সেভাবে ধন-সম্পদ ও টাকা উড়ায়। আর লাগামহীনভাবে ধন-সম্পদ খরচ করার ক্ষেত্রে তো তাদের কোনো বাধা-বিপত্তি নেই। জবাবদিহিতার কোনো বালাই নেই। একটি দৈনিক পত্রিকায় পড়েছিলাম, আরবরা বিশেষত সৌদি আরবে একটি বিবাহ-অনুষ্ঠানে অথবা সরকারি ভোজে বা অনুষ্ঠানে এত পরিমাণ খাবার অপচয় করা হয়, যদ্দারা রোহিঙ্গা অসহায় মুসলিমদের এক মাসের খাবারের ব্যবস্থা করা যায়!!! তাছাড়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, আরব-দেশগুলোর বিশেষত সৌদি আরবের ধন-সম্পদের বড় একটা অংশ কাফিররা বিশেষত আমেরিকা লুটে নিয়ে যায়। আর বর্তমানে সৌদি আরবে যেসব আমেরিকান সৈনিক অবস্থান করছে, তাদের সব ধরনের ব্যয়ভার সৌদি সরকার বহন করে! মুসলিমদের টাকায় কাফিরদেরকে পালা হচ্ছে মুসলিমদেরকে জবাই করার জন্য!! *অনুবাদক*

সমাধানে রয়েছে ইসলামি জীবনব্যবস্থা। যেমন : পার্থিব ও অপার্থিব সব বিষয়ের সমাধান রয়েছে ইসলামে; যথা অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি। আর এগুলোর মাধ্যমে আমরা যাচাই করব আলিম-ওলামা, শাসক-বিচারক এবং অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি। জানা যাবে শাসকদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে অলঙ্ঘনীয় নীতিমালা ও সীমা নির্ধারণ করেছেন, সে-অনুসারে শাসকদের সাথে আচরণবিধি। যেমন : আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কেউ আইন প্রণয়ন করা, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব-সম্পর্ক রাখা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতা করা এবং মুসলিম জনসাধারণদের ধন-সম্পদ যেভাবে খুশি খরচ করা। অধিকাংশ মানুষ মনে করে, এ কাজগুলো করার অধিকার এসকল দায়িত্বশীল শাসকের রয়েছে; অথচ তারা জানে না যে, শাসকদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড আমাদের ইসলামি শরিয়তে মারাত্মক কবিরা গুনাহ। এসব কাজে তাদের অনুসরণ অনাবশ্যক; বরং আল্লাহর পরিবর্তে ভিন্ন কেউ আইন প্রণয়ন করা এবং কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ[৪৮] সম্পর্ক রাখা বড় কুফর, যা ব্যক্তিকে ধর্ম থেকে বের করে দেয়।

---

৪৮. **কাফিরদের সাথে মুয়ালাত তথা বন্ধুত্ব করার বিধান**

এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। তাদের মাঝে পরস্পরের সম্পর্ক ঈমানি সম্পর্ক ও ঈমানি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। তাদের মাঝে ব্যক্তিগত কোনো কারণে বা স্বার্থে বিদ্বেষ থাকতে পারে না। তবে যদি তার অপর ভাইয়ের মাঝে ঈমানবিধ্বংসী কোনো কারণ পাওয়া যায় তাহলে ভিন্ন কথা। এটা হলো কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক এক মুমিন-মুসলমানের মাঝে অপর মুমিন-মুসলমানের সম্পর্ক ও আচরণ। কাফিরদের সাথে একজন মুমিন-মুসলমানের কী ধরণের সম্পর্ক হবে, তা ইসলাম বলে দিয়েছে। কাফিরদের সাথে মুয়ামালাত তথা লেনদেন ইসলামের গণ্ডিতে থেকে বৈধ। তবে একজন মুসলিম কখনো কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না। এটা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অনেকগুলো প্রকাশক্ষেত্র রয়েছে। আমরা নিম্নে তার আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

বিধান : যদি কেউ কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে কাফির ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। কারণ কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত, আর সে তা লঙ্ঘন করেছে। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে এ ধরনের ঈমানবিধ্বংসী কার্যকলাপ থেকে হিফাজত করুন। আমিন।

প্রমাণাদি—

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۝﴾

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য হতে যে তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। [সূরা মায়িদা, আয়াত : ৫১।]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট তাফসিরবিদ আল্লামা ইবনু জারির তাবারি রাহি. তার 'তাফসিরে তাবারি'তে লিখেছেন—

ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين "فإنه منهم" يقول : فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهومن أهل دينهم وملتهم . فإنه لايتولى متول أحدا الا وهو به و بدينه وما هوعليه راض. وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصارحكمه حكمه. تفسيرالطبري

'যে মুমিনদের পরিবর্তে ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি 'সে তাদের অন্তর্ভুক্ত' এর ব্যাখ্যায় বলেন : যে ব্যক্তি কাফির, মুশরিক, নাস্তিক ও মুরতাদদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে মুমিনদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে, সে তাদের ধর্মের অনুসারী বলে গণ্য হবে। কারণ কেউ কাউকে তখনই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে যখন সে তার দীন-ধর্মকে মেনে নেয় এবং তার ওপর সন্তুষ্ট হয়। যখন সে তার ও তার ধর্মের ওপর সন্তুষ্ট হলো, তখন সে অবশ্যই তার পূর্বের সত্য এবং পছন্দনীয় ধর্মের সাথে শত্রুতা পোষণ করল; অপছন্দ করল। সুতরাং তার বিধান হবে ইহুদি-খ্রিষ্টান ও নাস্তিক-মুরতাদদের মতো; অর্থাৎ সেও কাফির হয়ে যাবে।' [*তাফসিরে তাবারি* : ২/২৭৭।]

لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتصافونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين. ثم علل النهى بقوله بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ أى إنما يوالى بعضهم بعضا لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفر، فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ من جملتهم وحكمه حكمهم. وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين واعتزاله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تراءى ناراهما» من تفسير الكشاف .

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى حلفاءَ وأنصارًا على أهل الإيمان; ذلك أنهم لا يُوادُّون المؤمنين، فاليهود يوالي بعضهم بعضًا، وكذلك النصارى، وكلا الفريقين يجتمع على عداوتكم. وأنتم -أيها المؤمنون- أجدرُ بأن ينصر بعضُكم بعضًا. ومن يتولهم منكم فإنه يصير من جملتهم، وحكمه حكمهم. إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتولون الكافرين. من التفسير الميسر.

{يأيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء} تُوَالُونَهُمْ وَتُوَادُّونَهُمْ {بَعْضهمْ أَوْلِيَاء بَعْض} لِاتِّحَادِهِمْ فِي الْكُفْر {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} مِنْ جُمْلَتهمْ {إِنَّ اللَّه لَا يَهْدِي الْقَوْم الظَّالِمِينَ} بموالاتهم الكفار من تفسير الجلالين.

فهذا النص عن إتخاذ اليهود والنصارى أولياء . وهذا التحذير - بل التهديد - بأن من يتولهم فهو منهم . وهذه الإشارة إلى أن الذين في قلوبهم مرض يوالونهم ، ويحتجون بأنهم يخشون الدوائر . وتنفير المسلمين من الولاء لمن يتخذون دينهم هزواً ولعباً والإشارة إلى أن هؤلاء يتخذون صلاة المسلمين - إذا قام المسلمون إلى الصلاة - هزواً ولعباً . . . كل أولئك لا يكون إلا ولليهود في المدينة من القوة والنفوذ والتمكن ، ما يجعل من الممكن أن تقوم هذه الملابسات ، وأن تقع هذه الحوادث؛ وأن يحتاج الأمر إلى هذا التحذير المشدد ، وإلى هذا التهديد المكرر؛ ثم إلى بيان حقيقة اليهود؛ والتشهير بهم والتنديد؛ وإلى كشف كيدهم ومناوراتهم ومداوراتهم على هذا النحو ، المنوع الأساليب . من تفسير ظلال القران.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب. بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إيماء على علة النهي، أي فإنهم متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضاً لاتحادهم في الدين وإجماعهم على مضادتكم. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أي ومن والاهم منكم فإنه

من جملتهم، وهذا التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام : «لا تتراءى ناراهما» من تفسير البيضاوي.

{ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ اليهود والنصارى أَوْلِيَآءَ} نهى تعالى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى ينصرونهم ويستنصرون بهم ويصافونهم ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ} أي هم يدٌ واحدة على المسلمين لاتحادهم في الكفر والضلال، وملةُ الكفر واحدة {وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} أي من جملتهم وحكمهُ حكمهمُ. من صفوة التفاسير.

উপরোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে তাবারি থেকে যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, তদ্দারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারা কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। ঠিক তেমনিভাবে উক্ত আয়াতের এ ব্যাখ্যাই উল্লেখ করা হয়েছে আরো বহু গ্রহণযোগ্য তাফসিরের কিতাবে। যেমন তাফসিরুল কাশ্‌শাফ, আততাফসিরুল মুয়াস্‌সার, তাফসিরুল জালালাইন, তাফসিরু জিলালিল কুরআন, তাফসিরুল বায়জাবি, সফওয়াতুত তাফাসির। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এসব তাফসিরের কিতাবের ইবারত বা নস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

و أيضا فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين و بين المحادين لله و رسوله و المعادين لله و رسوله فقال تعالى : { لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا آباءهم } الآية [المجادلة : ٢٢] و قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة } [الممتحنة : ١] فعلم أنهم ليسوا من المؤمنين

আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত উভয় আয়াতে মুমিনদের মাঝে এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধীতা ও শত্রুতা করে তাদের মাঝে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হওয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন। সূতরাং বুঝা গেল, যারা কাফির-মুশরিকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারা আর মুমিন থাকতে পারবে না; বরং তারাও কাফির ও মুশরিক হয়ে যাবে। [*আস্‌সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল*, পৃষ্ঠা : ৩১।]

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝﴾

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টতার আশঙ্কা করো, তাহলে তাদের সাথে সাবধান হয়ে থাকবে। আল্লাহ নিজেই তোমাদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আর সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।’ [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৮।]

ইমাম তাবারি রাহি. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—

ومعنى ذلك : لا تتخذوا، أيها المؤمنون، الكفارَ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، (٢) وتدلُّونهم على عوراتهم، فإنه مَنْ يفعل ذلك ="فليس من الله في شيء"، يعني بذلك : فقد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ="إلا أن تتقوا منهم تقاة"، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مُسلم بفعل.

আয়াতের মর্মার্থ হলো, হে মুমিনগণ! তোমরা কাফিরদেরকে সাহায্য-সহায়তাকারীরূপে এমনভাবে গ্রহণ করো না যে, তোমরা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে তাদের ধর্মের ক্ষেত্রে ভালোবাসবে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে এবং মুমিনদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা তাদের কাছে প্রকাশ করবে। কারণ, যে এ ধরনের কাজ করবে সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত; অর্থাৎ এসব কর্মের কারণে মুরতাদ হয়ে কুফরে প্রবেশ করায় তার সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক এবং তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। তবে যদি মুসলিমরা তাদের ক্ষমতার অধীনে থাকে এবং নিজেদের ওপর তাদেরকে ভয় করে, তাহলে মৌখিকভাবে তাদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে এবং অন্তরে তাদের প্রতি শত্রুতা গোপন রাখবে। তোমরা কুফরি কাজে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবে না এবং কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে তাদেরকে কার্যত সহযোগিতা করবে না।

বি.দ্র. যদি বাস্তবেই কোনো মুসলিম কাফিরদের ক্ষমতার অধীনে থাকতে বাধ্য হয় এবং তাদের থেকে কেটে পড়ার কোনো পথ বাকি না থাকে, তাহলে শুধু মৌখিকভাবে তাদের তোষামোদ করা যাবে। তবে তাদের সাথে তাদের কোনো কুফরি কাজে কোনো অবস্থাতেই অংশগ্রহণ করা যাবে না এবং কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করা যাবে না। যদি কোনো মুসলিম তাদের অনিষ্টের ভয়ে কোনো কুফরি কাজে কার্যত লিপ্ত হয় বা কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করে, তাহলে সে কাফির ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

قال ابن حزم : صح أن قول الله تعالى " ومن يتولهم منكم فإنه منهم" إنما هوعلى ظاهره بأنه كافرمن جملة الكفار وهذا حق لايختلف فيه اثنان من المسلمين. " المحلي" ١٣\٣٥ تحقيق حسن زيداه سنة ١٣٩٢من الهجري. الناشرمكتبة الجمهورية العربية بمصر.

আল্লামা ইবনু হাযম রাহি. বলেন, ‘যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত’ এ আয়াতটি বাহ্যিক অবস্থার ওপর প্রয়োগ হবে যে, সে কাফিরদের মধ্য হতে একজন কাফির। এটি এমন একটি বিষয় যার ব্যাপারে মুসলিমদের থেকে দু-জন ব্যক্তিও মতানৈক্য করে নি।

قال ابن تيمية : أخبرالله في هذه الاية – أن متوليهم هو منهم . قال الله تعالى : وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياء

فدل على أن الإيمان المذكورينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولايجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب فلقران يصدق بعضه بعضا. انظر"الايمان" لابن تيمية ص ١٤ طبع المكتب الاسلامي.

‘শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহি. বলেন, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সংবাদ দিয়েছেন, যে তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং রাসুলের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে তারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। এ আয়াত প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ বিষয়াদির ওপর ঈমান আনা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নাকচ করে এবং তার বিরোধিতা করে। আর ঈমান এবং কাফিরদেরকে অন্তর থেকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা কখনো একত্রিত হতে পারে না।’ [*কিতাবুল ঈমান*; (ইবনু তাইমিয়া) পৃষ্ঠা : ১৪।]

কাফিরদের সাথে মুয়ালাত তথা বন্ধুত্ব করার ধরণ ও প্রকাশক্ষেত্র

১. কাফিরদের কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাদেরকে কাফির না বলা বা তাদের কাফির বলার ব্যাপারে সন্দেহ করা অথবা কাফিরদের গড়া কোনো আদর্শ, সভ্যতা ও মতাদর্শের কোনো একটাকে সঠিক সাব্যস্ত করা বা বলা।

বি.দ্র. *যাদের কুফর সকলের কাছে স্পষ্ট এবং যাদেরকে কাফিরই মনে করা হয়, এদেরকে যদি কোনো মুসলিম কাফির মনে না করে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর যাদের কুফর স্পষ্ট না, যদিও তারা বাস্তবেই কাফির হয়ে থাকে, তাহলে এমন লোকদেরকে যদি কোনো মুসলিম কাফির মনে না করে তাহলে সে কাফির হবে না।*

২. কাফিরদেরকে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করা অথবা তাদের ধর্ম গ্রহণ করা। [*আল ওলা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ২৩২।]

৩. কাফিরদের কতক কুফরের ওপর বিশ্বাস করা অথবা আল্লাহর কিতাবকে বাদ দিয়ে তাদের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া। [*আল ওলা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ২৩৬।]

৪. তাদেরকে ভালোবাসা ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করা। [*আল ওলা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ২৩৮।]

৫. কাফিরদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দীন বিসর্জন দিয়ে তাদের সাথে সুন্দর ও নম্র আচরণ করা। [*আল ওলা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ২৩৯।]

বি.দ্র. এটা প্রথমে ছোট ছোট বিষয়ের মাধ্যমে শুরু হয় এবং তা স্বাভাবিকই মনে হয়। আর এ ছোট ও স্বাভাবিক আচরণের কারণে শরিয়তের পক্ষ থেকে তার ওপর কোনো কঠিন বিধান প্রয়োগ হয় না ঠিকই; কিন্তু এক পর্যায়ে এমন কিছু কাজ করে, যা তাদেরকে দীন-ধর্ম থেকে বের করে দেয় এবং তাদেরকে কাফির বানিয়ে ছাড়ে। এজন্য মুসলিমদের এ ধরনের আচরণ থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত জরুরি। নয়তো শেষ পর্যন্ত নিজেদের মহামূল্যবান সম্পদ ঈমানকে ধ্বংস করে নরকের কীট হতে হবে। হে আল্লাহ! তুমি মুসলিম উম্মাহকে এ ধরনের ভয়ংকর কাজ থেকে হিফাজত করো। আমিন।

৬. কোনো মুসলিম কর্তৃক মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে অভিভাবক বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করা। [*আল ওলা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ২৪১।]

৭. কাফিরদের দিকনির্দেশনা ও পদ্ধতির অনুসরণ করা। [*মাজমুয়াতুত তাওহিদ*, পৃষ্ঠা : ১১৭।]

৮. যখন কাফিররা কুরআন ও সুন্নাহর কোনো আয়াত বা বিধিবিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা হাসি-তামাশা করে অথবা কুরআন সুন্নাহর কোনো বিধানকে অযৌক্তিক বুলি আওড়িয়ে আপত্তি করে, তখন তাদের সঙ্গ দেয়া বা তাদের সাথে অবস্থান করা।' [*আল ওলা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ২৪৩।]

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন, যখন কাফিরদের সাথে এ অবস্থায় অবস্থান করার কারণেই যখন কোনো মুসলমানের মুসলিম থাকার সুযোগ নেই, তাহলে যে মুসলিম নিজেই এ ধরনের ভয়ংকর কাজে লিপ্ত হবে তার বিধান কী হতে পারে?

৯. কাফিরদের কার্যক্রমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা এবং তাদের সভ্যতা ও কালচার গ্রহণ করা।' [*মাজমুয়াতুত তাওহিদ*, পৃষ্ঠা : ১১৭।]

১০. মুসলিমদেরকে নির্যাতন-নিপীড়নের ক্ষেত্রে কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।' [*আল ওলা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ২৪৫।]

আর এ ধরনের শাসকদের বিরুদ্ধে আবশ্যকীয় প্রস্তুতিপর্ব [৪৯] শেষ করে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ[৫০] ঘোষণা করতে হবে। যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহ

সচেতন পাঠক! একটু গভীরভাবে ভাবুন তো, এটা কি জ্বলন্ত বাস্তবতা নয় যে, বর্তমানবিশ্বে কাফিরদের পক্ষ হয়ে মুসলিমরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কী ধরনের ভূমিকা পালন করছে?

১১. কাফিরদের কল্যাণ কামনা করা, তাদের প্রশংসা করা এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করা।' [*মাজমুয়াতুত তাওহিদ*, পৃষ্ঠা : ১১৭।]

বি.দ্র. বর্তমান পৃথিবীব্যাপী এ কাজটাই পূর্ণাঙ্গ বিশ্বস্ততা এবং গুরুত্বের সাথে আদায় করে যাচ্ছে মুসতাশরিকরা তথা প্রাচ্যবিদরা। আল্লাহ হিফাজত করুন, এ ধরনের কাজ আজ মুসলমানের সন্তানরাও ব্যাপকভাবে করে যাচ্ছে।

১২. মুসলিমদের বিষয় নিয়ে কাফিরদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের সে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা অথবা তাদের কোনো বাহিনীতে তাদের হয়ে কাজ করা অথবা কাফিরদের পক্ষ নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করা এবং মুসলিমদের গোপন বিষয়গুলো তাদেরকে জানিয়ে দেয়া অথবা তাদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।' [*আল-ঈমান*, ড. মুহাম্মাদ নাইম ইয়াসিন, পৃষ্ঠা : ১৪৭।]

সচেতন পাঠক! একটু গভীরভাবে চারদিকে আপনি পর্যবেক্ষণকারীর ন্যায় দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করুন। আশা করি এগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র মুসলিমদের মধ্যেই ব্যাপকভাবে পাবেন।

১৩. দারুল ইসলাম থেকে দারুল কুফরে চলে যাওয়া মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে—কাফিরদের ভালোবাসায়।' [*আর রিদ্দাহ বাইনাল আমসি ওয়াল ইয়াওমি*, পৃষ্ঠা : ৩৩।]

১৪. ধর্মনিরপেক্ষ কোনো দলে বা খোদাদ্রোহী তথা নাস্তিকদের কোনো দলে প্রবেশ করা বা সদস্য হওয়া—তাদের স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যে। যেমন : সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র। [*আর রিদ্দাহ বাইনাল আমসি ওয়াল ইয়াওমি*, পৃষ্ঠা : ৪০।]

বি.দ্র. উপরিউক্ত কারণগুলোর মধ্য হতে একটি কারণও যদি কারো মধ্যে পাওয়া যায়, সে কাফির ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমকে এ ধরনের ভয়ংকর কাজ থেকে হিফাজত করুন। আমিন।

৪৯. শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহি. বলেন, 'জিহাদ থেকে অক্ষম অবস্থায়ও জিহাদের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা এবং ঘোড়া প্রস্তুত করা আবশ্যক। কারণ, যে জিনিস ছাড়া ওয়াজিব আদায় করা যায় না সেটাও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হয়ে যায়।' [*মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া* : ২৮/২৫৯।]

৫০. আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানি রাহি. বলেন, 'যখন কোনো সরকার বা রাজা-বাদশাহ থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশিত হবে, তখন সে-ক্ষেত্রে তার অনুসরণ

পাঠ করত এবং তাতে গভীরভাবে চিন্তা করত (যেমনটা একজন মুসলিম হিসেবে করাটা উচিত ছিল) তাহলে বিষয়টি বহু নুসুসের (দলিলের) আলোকে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যেত।

এ ক্ষেত্রে হজরত আদি ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসটি লক্ষ করুন। তিনি জাহিলি যুগে খ্রিষ্টান ছিলেন। তিনি ধারণা করতেন যেমনটা অনেক মানুষ ধারণা করে থাকে যে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করা এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার ব্যাপারে ওলামা ও আমির-উমারার অনুসরণ করাটা তাদের ইবাদত করা নয় এবং আল্লাহর সাথে কুফরিও নয়; কেননা সে তো তাদের জন্য নামাজ পড়ে নি এবং রোজা রাখে নি। কিন্তু তিনি যখন রাসুলের কাছে আগমন করলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত পাঠ করছিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

‘তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মরিয়মপুত্র মাসিহকেও; অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল শুধুমাত্র এক ইলাহের ইবাদতের জন্য, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তারা যে শরিক সাব্যস্ত করেছে, তা থেকে তিনি পবিত্র।’ [সূরা তাওবা, আয়াত : ৩১।]

অতঃপর হজরত আদি ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! তারা তো তাদের ইবাদত বা উপাসনা করত না। রাসুল ﷺ তার প্রতিউত্তরে বলেন—‘হ্যাঁ, তারা অবশ্যই তাদের

আবশ্যক নয়; বরং আবশ্যক হলো সামর্থ্যনুপাতে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।’ [*ফাতহুল বারি* : ৭/১৩।]

আল্লামা কাজি ইয়াজ রাহি. বলেন, ‘সকল আলিম এ কথার ওপর একমত যে, কাফিররা সরকার বা রাজা-বাদশাহ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। যদি কখনো কোনো বাদশাহ বা সরকার থেকে কুফর প্রকাশিত হয়, তখন সে নিজ থেকেই সরকার বা রাজা-বাদশাহের পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে যায়।’ [*শরহু মুসলিম* : ১২/২৫৯।]

ইবাদত করত। তার প্রমাণ হলো, ইহুদি ধর্ম-পণ্ডিত এবং খ্রিষ্টান সংসারবিরাগীরা হালালকে হারাম বানাত আর হারামকে করত হালাল, অতঃপর তোমরা তাদের অনুসরণ করতে। এ-ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করার অর্থই হলো তাদের ইবাদত বা উপাসনা করা।’ [*সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ৩০৯৫; *হাকিকাতুল ইসলাম ওয়াল ইমান* : ১১১, আল্লামা হাফিজ ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এর সনদ হাসান।]

উল্লিখিত আয়াতটির দিকে একটু লক্ষ্য করুন। এই আয়াত ও হাদিসটি সুস্পষ্টভাবে এ কথার প্রমাণ করে যে, ‘হালালকে হারাম বানানো এবং হারামকে হালাল করা’র ক্ষেত্রে শাসক-বিচারক, আলিম-ওলামা[৫১] অথবা

---

৫১. শাইখ, আলিম-ওলামা, উস্তাদ বা পীরের অন্ধ অনুসরণ নয়; বরং তাদের অনুসরণ হবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে—

কুরআন ও সুন্নাহ হলো সমগ্র মানবজাতির পথনির্দেশিকা বা গাইডলাইন। সাহাবায়ে কেরামের আদর্শই হলো সমগ্র মানবজাতির আদর্শ। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর আবশ্যক। আর কোনো শাইখ বা উস্তাদ বা পীরের অনুসরণ করতে হলে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে করতে হবে। তাদের কাউকে অন্ধ অনুসরণ করার কোনো সুযোগ ইসলামি শরিয়তে নেই। আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো শাইখ বা উস্তাদ বা পীর বা শাসক বা ওলামায়ে সু বা এজাতীয় অন্য কাউকে মান্য করার কোনো অধিকার কারো নেই। কারণ ইসলাম তা সমর্থন করে না। মনে করেন, আপনি কোনো শাইখ বা পীরের মুরিদ। তাকে আপনি অনুসরণ করেন। অথচ আপনি জানেন না যে, আপনার শাইখ আপনাকে যে কাজের আদেশ করেছেন বা যে কথা বলেছেন, তা কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থন করে কি-না অথবা আপনার শাইখ বা পীর একটি মাসআলা বলেছেন। অথচ আপনি জানেন যে, তার এ মাসআলাটি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার শাইখ বা পীরকে অনুসরণ করেন, তাহলে কোনো সুস্থ বিবেক তো তার এ অনুসরণকে বৈধতা দেবেই না, আর কুরআন ও সুন্নাহ তো দূরের কথা; অথচ কখনো এ ধরনের অনুসরণ কুফরের সীমানায় নিয়ে যায়। আল্লাহ সকলকে এ ধরনের অনুসরণ থেকে মুসলিমদেরকে হিফাজত করুন। বিশেষ করে তালিবুল ইলম এবং কোনো পীর সাহেবের মুরিদদেরকে। উপরের শিরোনামের কথাগুলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাচাই করে নিই।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মরিয়মপুত্র মাসিহকেও; অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল শুধু এক ইলাহর ইবাদত করতে, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ

নেই। তারা যেসব শরিক সাব্যস্ত করেছে তিনি তা থেকে পবিত্র।' [সূরা তাওবা, আয়াত : ৩১।]

'হজরত আদি ইবনু হাতিম [রা.] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গলায় স্বর্ণের একটি ক্রুশ পড়ে রাসুল [সা.] এর নিকট আগমন করলাম। তিনি বললেন, হে আদি! এই মূর্তিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দাও; এবং আমি শুনলাম যে, তিনি সূরা বারাআতের এ আয়াত পাঠ করছেন, **'তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে'**। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! তারা তো তাদের ইবাদত করত না। রাসুল [সা.] বলেন, আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম সাব্যস্ত করত এবং তোমরাও তা হারাম মনে করতে আর আল্লাহ যা হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তারা তা হালাল সাব্যস্ত করত এবং তোমরাও তা হালাল মনে করতে বিষয়টা কি এমন নয়? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এমনটিই হতো। রাসুল [সা.] বলেন, এটাই তাদের ইবাদত।' [*সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ৩০৯৫; *হাকিকাতুল ইসলাম ওয়াল ইমান* : ১১১, আল্লামা হাফিজ ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এর সনদ হাসান।]

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ۝٦٦ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ۝٦٧ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝٦٨﴾

'যেদিন কাফিরদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে ওলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করতাম। তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনে ছিলাম। অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। হে আল্লাহ! তাদেরকে দিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করো।' [সূরা আহজাব, আয়াত : ৬৬-৬৮।]

প্রিয় পাঠক! নিজেকে নিয়ে একটু ভেবে দেখুন। উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো আপনার ওপর প্রয়োগ হয়ে যাচ্ছে না তো? শরিয়তের কোনো হুকুম স্পষ্টভাবে জানা ও বুঝার পরও শুধু শাইখ, উস্তাদ, পীর, আলিম-ওলামা ও শাসককে মানার বাহানা দিয়ে শরিয়তের কোনো বিধান বা হুকুম এড়িয়ে যাচ্ছেন না তো? জেনে রাখুন রাসুল [সা.] বলে গেছেন, 'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টি বা মাখলুকের আনুগত্য চলবে না।' [*সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/৩৯২; সহিহ হাদিস।]

আল্লাহ তাআলা আপনাকে সুস্থ বুদ্ধি দিয়েছেন, চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও দিয়েছেন, চিন্তা-ভাবনা করার আদেশও করেছেন এবং সঠিক বিষয় জানার জন্য বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ কিতাব ও বই-পুস্তকও রয়েছে, তথাপি আল্লাহর অবাধ্যতায় পীর বা শাইখ বা উস্তাদের অনুসরণ করছেন কেন? যে পীর বা শাইখ বা উস্তাদের কথায় বা অপব্যাখ্যায় আল্লাহর হুকুম পালন করা থেকে বিরত থাকছেন, যে

অন্য ব্যক্তিদের আনুগত্য ও অনুসরণ করার অর্থই হলো, আল্লাহর পরিবর্তে তাদের অনুসরণ করা। এটা হলো শিরকে আকবর [বড় শিরক], যা ব্যক্তিকে দীন থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদেরকে এ ধরনের ভয়ংকর গুনাহ থেকে হিফাজত করুন। আমিন।

আর আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে এ কথাটাই বলেছেন এবং নিজের সম্মানিত ও পবিত্রতম সত্তাকে এ ধরনের ভয়ংকর কর্ম থেকে পবিত্র ঘোষণা করে বলেন—

﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٣١﴾

'তারা যে শিরক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।' [সূরা তাওবা, আয়াত : ৩১।]

আল্লাহ তাআলার বাণী—

'তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র', এ কথাটিই বর্ণিত উক্ত আয়াতের এ কথার পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তাদেরকে শুধুমাত্র এক ইলাহ বা প্রভুর ইবাদত করার আদেশ করা হয়েছে, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।' এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, হালাল ও হারাম-করণের ব্যাপারে কেউ নিজের পক্ষ থেকে বিধান করা বা আইন প্রণয়ন করা অথবা এ-ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করার অর্থই হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য

শাসকের দোহাই দিয়ে আল্লাহর হুকুম পালন করতে দ্বিধা করছেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে তারা আপনার কোনো কাজেই আসবে না। বলাবাহুল্য যে, শাইখ বা পীর বা উস্তাদ তারা কেউ কিন্তু শরিয়ত-প্রণেতা নন যে, তারা যা বলবে তা-ই শরিয়ত, তা-ই মানতে হবে এবং তাদের কোনো কথা শরিয়ত-বিরোধী হলেও তা মানতে হবে। তারা যদি এমন কোনো কথা বলে যা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে আপনার খটকা লাগে, তাহলে তার কাছে দলিল বা প্রমাণ দাবি করুন। তিনি যদি হক্কানি-রব্বানি শাইখ বা পীর হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই তিনি দলিল-প্রমাণের আলোকে আপনার খটকা দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। আর যদি তিনি দলিল-প্রমাণ চাওয়ার কারণে রাগান্বিত হন, আপনার ওপর রুষ্ট হন, চোখ রাঙান এবং আপনাকে বেয়াদব বলেন, তাহলে আপনাকে আপনার ঈমান ও আমল হিফাজত করার লক্ষ্যে তাকে বিদায় জানাতে হবে এবং অন্য কোনো শাইখ বা পীর বা উস্তাদকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অনুসরণ করতে হবে। *অনুবাদক*

কারো ইবাদত করা; অথচ কোনো জিনিস হালাল বা হারাম করা একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়টি একমাত্র তাঁরই অধিকারে; তাতে অন্য কারো কোনো ধরনের নাক গলাবার অধিকার নেই। তাছাড়া এ বিষয়টিও আল্লাহর সাথে বিশেষিত যে, হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করতে পারবে। হালাল বা হারামকরণ-বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করার অর্থই হলো, আল্লাহর পরিবর্তে তাঁর ইবাদত করা। আর এ বিষয়টি কালিমাতুত তাওহিদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি, ইসলামের আরকানসমূহের প্রথম রুকন, আর সর্বোপরি এটিই হলো ইসলামের মূল ভিত্তি।

এই পূর্বোক্ত আলোচনায় ওইসব ব্যক্তিদের জন্য বড় গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা রয়েছে, যারা মনে করে থাকে—কালিমাতুত তাওহিদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' শুধুই মুখে উচ্চারণের বিষয়, শুধু মুখে আওড়ানোর মতোই একটি বিষয়! অথচ তারা জানে না, কালিমাতুত তাওহিদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দাবি[৫২]।

৫২. কালিমাতুত তাওহিদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু দাবি রয়েছে, যারা সে দাবিগুলো গ্রহণ না করে এবং সেগুলো জীবনযাত্রায় বাস্তবায়ন না করে, তারা মূলত তাওহিদের বাণী 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কেই গ্রহণ করে নি, মেনে নেয় নি কালিমার বাণীকে। এর অন্যতম দাবি হলো, যেসব বিষয় দ্বারা ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় সেসব বিষয় থেকে নিজেকে শতভাগ বাঁচিয়ে রাখা। নিম্নে ঈমান ভঙ্গের কিছু মৌলিক কারণ এবং যে ব্যক্তি কালিমাতুত তাওহিদ তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রতি বাস্তবার্থেই স্বীকৃতি দেয় তার মধ্যে এই কালিমার বিশ্বাস কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, তার বিবরণ তুলে ধরব। প্রথমে ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ উল্লেখ করছি—

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ তথা নিম্নেবর্ণিত কারণসমূহের মধ্য হতে যে-কোনো একটি কারণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে।

১. আল্লাহ তাআলাকে গাল-মন্দ করা।
২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গাল-মন্দ করা।
৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবি না মানা।
৪. আল্লাহ ছাড়া যে-কোনো জিনিসকে যে-কোনো উদ্দেশে সিজদা করা।
৫. দীনের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস অথবা অকাট্য বিধানের বিরোধীতা শরিয়তে হস্তক্ষেপের নামান্তর, যা সুস্পষ্ট কুফরি।
৬. ইসলাম ধর্মের কোন 'জরুরিয়াতে দীনের' অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি সাধন করা।

৭. শরিয়তের যে-কোন ফরজ বিধানকে অস্বীকার করা।
৮. ইসলাম, নবি, কুরআন, ইসলামি নিদর্শন কিংবা ইসলামের কোনো বিধানকে ঠাট্টা বা হেয় প্রতিপন্ন করা।
৯. শরিয়তের কোনো বিধানের ওপর আপত্তি করা অথবা তা সংস্কারযোগ্য মনে করা।
১০. ইসলাম ধর্মের কিছু বিধান ও বিশ্বাসকে মানা, আর কিছু না মানা।
১১. ইসলাম ধর্মের কোনো বিধানকে কুসংস্কার অথবা ইসলামকে এই আধুনিক যুগে অচল বা সেকেলে [প্রাচীনকালীন] ধর্ম মনে করা।
১২. মানবরচিত যে-কোনো আদর্শ ও সভ্যতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা।
১৩. কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা।
১৪. যেসব কাজ কাফিরদের নিদর্শন ও প্রথা তা পালন করা কুফরি।
১৫. কারো কোনো 'কুফরি কাজের' সত্যায়ন বা সমর্থন করা।
১৬. আল্লাহর নাজিলকৃত কোনো বিধানের প্রতি আস্থার অভাবে ঈমান-বিশ্বাস আনতে বিলম্ব করা।
১৭. কুফরিকে খেল-তামাশার বস্তু বানানো।
১৮. নবী বা রাসুল হওয়ার দাবি করা অথবা নিজের কাছে ওহি আসার দাবি করা।
১৯. কোনো হালাল জিনিসকে হারাম মনে করা আর কোনো হারাম জিনিসকে হালাল মনে করা।
২০. কাফিরদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।
২১. কাফিরদের কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাদেরকে কাফির না বলা বা তাদের কাফির বলার ব্যাপারে সন্দেহ করা অথবা কাফিরদের হাতে বানানো কোনো আদর্শ, সভ্যতা ও মতাদর্শের কোনো একটাকে সঠিক সাব্যস্ত করা বা বলা।

বি.দ্র. শাইখুল ইসলাম আল্লামা হাফিজ ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর লিখিত কিতাব 'আস্‌সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল', আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহি.-এর লিখিত কিতাব 'ইকফারুল মুলহিদিন', আমিনুত তালিম মাওলানা আবদুল মালেক হাফি.-এর লিখিত কিতাব 'ঈমান সবার আগে' এই তিন কিতাবে উল্লিখিত কারণসমূহ পাবেন। আগ্রহী ভায়েরা দেখে নিতে পারেন। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন।

মানব-জীবনে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকৃতিদানের প্রভাব

১. এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা কখনো সংকীর্ণমনা হয় না। পক্ষান্তরে যারা একাধিক ইলাহে বিশ্বাসী কিংবা কালিমাতে অবিশ্বাসী, তারা হয় সংকীর্ণ মনের ও অপ্রশস্ত হৃদয়ের।
২. এ কালিমার প্রতি বিশ্বাস অন্তরে এমন গর্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে, যার সামনে দুনিয়ার কিছুই দাঁড়াতে পারে না। কারণ, উপকারের মালিক একমাত্র আল্লাহ। ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনিই শাসন, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের মালিক। এ কারণেই কালিমায় বিশ্বাসী

ব্যক্তির অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় ছাড়া সমস্ত ভয় উপড়ে ফেলা হয়। ফলে সে কোনো মাখলুকের সামনে মস্তকবনত করে না, কারো নিকট মিনতি করে না, কারো সামনে হাত পাতে না এবং কারো বড়ত্ব ও বিশালতা দেখে ভয় পায় না। কেননা আল্লাহই মহান ও ক্ষমতাধর। মুশরিক, কাফির ও নাস্তিকের অবস্থা ভিন্ন।

৩. এ কালিমার প্রতি বিশ্বাস থেকে গর্ব ও আত্মমর্যাদাবোধের পাশাপাশি জন্ম লাভ করে লাঞ্ছনাহীন বিনয় ও অহংকারমুক্ত উঁচুতা। ফলে ধোঁকাবাজ শয়তান তার রগকে ফোলাতে পারে না এবং তার ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা দ্বারা তাকে অহংকারী বানাতে পারে না। কেননা সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, আল্লাহ তাকে তার নিকট থাকা সবকিছু দান করেছেন, তিনি সেগুলো যখন ইচ্ছা ছিনিয়ে নিতে পারেন। ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সে যখন কোনো তাৎক্ষণিক নেয়ামত লাভ করে, অহংকার ও অহমিকা প্রদর্শন করে।

৪. এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে জানে, আত্মশুদ্ধি ও নেকআমল ব্যতীত মুক্তি ও সফলতার কোনো পথ নেই। পক্ষান্তরে মুশরিক ও কাফিররা নিজেদের জীবনকে কিছু অলীক আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর অতিবাহিত করে। তাদের কেউ বলে, আল্লাহর পুত্র তার পিতার নিকট আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। কেউ বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। অতএব তিনি আমাদের পাপের কারণে আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেবেন না। কেউ বলে, আমরা আমাদের বড় ও মুত্তাকিদেরকে আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে বলব। আবার কেউ নিজ উপাস্যের নিকট এ ধারণাবশত মান্নত পেশ করে যে, সে তদ্দারা যা ইচ্ছা তা-ই করার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি, যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, সে মনে করে, সে এ দুনিয়ায় স্বাধীন। আল্লাহর শরিয়তের নিকট সে দায়বদ্ধ নয়। তার উপাস্য হলো, তার প্রবৃত্তি ও মনের চাহিদা এবং সে এ দুয়ের দাস।

৫. এ কালিমার প্রবক্তার নিকট পৌঁছার জন্য হতাশা পথ খুঁজে পায় না। তার নিকট আসন গেড়ে বসতে পারে না। কারণ, তার এই বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই আসমান-জমিনের ধনভাণ্ডারের মালিক। এ কারণেই সে থাকে শান্ত, নিশ্চিন্ত ও আশাবাদী, যদিও তাকে বিতাড়িত করা হয়, লাঞ্ছিত করা হয় এবং জীবনোপকরণ তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়।

৬. এ কালিমার প্রতি বিশ্বাস মানুষকে দৃঢ় সংকল্প পদক্ষেপগ্রহণ, ধৈর্যধারণ, স্থিরতা, অবিচলতা প্রভৃতি মহান শক্তির ওপর প্রতিপালিত করে, যখন সে এ গুণগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে ধারণ করে, সে অনুভব করে, তার পেছনে রয়েছে আসমান-জমিনের মালিকের অদৃশ্য শক্তি। ফলে তার দৃঢ়তা, অবিচলতা; এবং এ আকিদা থেকে গৃহীত অনড়তা হয় সুদৃঢ় পাহাড়সম। কাফির ও মুশরিক এ শক্তি ও অবিচলতা কোথা থেকে পাবে?!

৭. এ কালিমা মানুষকে সাহসী বানায় এবং তাদের অন্তর সাহসে ভরে দেয়। কারণ দুটি জিনিস মানুষকে কাপুরুষ ও হীনবল বানায়। **এক.** নিজের জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের ভালোবাসা। **দুই.** এ বিশ্বাস থাকা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ মৃত্যু

দিতে পারে। আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিশ্বাস অন্তর থেকে এ উভয় কারণ উপড়ে ফেলে দেয়।

কালিমা তাকে এ বিশ্বাসী বানায় যে, আল্লাহই তার জান-মালের একমাত্র মালিক। তখন সে তার কাছে থাকা সাধারণ ও মূল্যবান সবকিছু তার রবের সন্তুষ্টির পথে বিসর্জন দেয়। আর এ বিশ্বাস দ্বিতীয় কারণটিকে এভাবে মূলোৎপাটন করে যে, কোনো মানুষ, কোনো প্রাণী, কোনো বোমা, কোনো কামান, কোনো তরবারি ও কোনো পাথর তার জীবন ছিনিয়ে নিতে পারে না। তা পারেন একমাত্র আল্লাহ।

এ কারণেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তির তুলনায় অধিক সাহসী ও নির্ভীক মানুষ পৃথিবীতে হয় না। সেনাবাহিনীর অভিযান, কোষমুক্ত তরবারি, বুলেট ও বোমাবর্ষণ তাকে ভয় দেখাতে পারে না; তার সামনে দাঁড়াতে পারে না। কেননা সে যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য অগ্রসর হয়, তখন নিজের শক্তির তুলনায় দশগুণ বেশি শক্তিকে পরাজিত করে। কাফির, মুশরিক ও ধর্মদ্রোহীরা এ শক্তি কোথা থেকে পাবে?

৮. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিশ্বাস মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে বড়ত্ববোধ, অল্পেতুষ্টি ও মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষিতা। তাদের অন্তরকে লোভ, লালসা, হিংসা, হীনতা ও নীচতা প্রভৃতি মন্দ অভ্যাস থেকে পবিত্র করে।

৯. এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিশ্বাস মানুষকে শরিয়তের দায়বদ্ধ ও তার প্রতি যত্নশীল বানায়। কারণ ঈমানদার এ কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, তিনি শাহরগের চেয়েও মানুষের অধিক নিকটবর্তী এবং সে কোনো মানুষের পাকড়াও থেকে বেঁচে যেতে পারলেও আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। *[আল-ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম।]*

মানুষের অন্তরে এ বিশ্বাস যে পরিমাণ থাকবে, সে সেই পরিমাণ শরিয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হবে, শরিয়তের সীমারেখায় অবিচল থাকবে। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা করার দুঃসাহস দেখাবে না। উপরন্তু আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালনে ও কল্যাণকর কাজে দ্রুত অগ্রসর হবে।

এ কারণেই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিশ্বাসকে একজন ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার জন্য প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন সাব্যস্ত করা হয়েছে। মুসলিম হলো ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর অনুগত ও তাঁর সমীপে আত্মসমর্পণকারী। আর কেউ মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত হয় না যতক্ষণ না সে অন্তর থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'তে বিশ্বাসী হয়। এটাই হলো ইসলামের গোড়ার কথা ও শক্তির উৎস। এ ছাড়া ইসলামের যত আকিদা ও হুকুম এবং বিশ্বাস ও বিধান রয়েছে সেগুলো এর ওপর নির্ভরশীল, এর থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে। এই ভিত্তিমূল দূর হয়ে গেলে ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এ কালিমার রয়েছে অনেক ফজিলত। আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলি রাহি. [৭৩৬-৭৯৫হি.]

যারা সে দাবিগুলো গ্রহণ করে না এবং সেগুলো জীবনযাত্রায় বাস্তবায়ন করে না, তারা মূলত তাওহিদের বাণী 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কেই গ্রহণ করে নি; মেনে নেয় নি কালিমার বাণী।

আলোচিত কথার সারমর্ম

এ বিষয়টিও ইসলামের মানহাজ ও কর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত যে, শাসক ও বিচারকদের হিসাব চাওয়া; তাদেরকে সব-কিছুর ব্যাপারে স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। তারা যা-কিছু করবে সব-কিছুর ব্যাপারে ইসলামি আইন অনুযায়ী তাদের থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে। কারণ, যখন শাসকবৃন্দ আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ও মানহাজের আলোকে চলে ঠিক হবে, তখনই ঠিক হবে দেশ ও দশের সকল বিষয়। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর জীবনযাত্রায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উধাও হয়ে যাওয়াটা খুবই ভীতিকর। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য হলো, এই মাসআলাটি খুব ভালো করে স্মরণ রাখা এবং তা অনুধাবন করা।

বলাবাহুল্য যে, বর্তমানে আমরা পুরো পৃথিবীব্যাপী ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রু, এমনকি সমগ্র মানবজাতির দুশমন কাফির-বেঈমান, নাস্তিক, মুসলিম-নামধারী মুরতাদ শাসক, খারেজি, রাফেজিদের বিরুদ্ধে যে জিহাদি মিশন ও অপারেশন পরিচালনা করছি, এর একমাত্র লক্ষ্য—পুরো পৃথিবী সংশোধন করা। নির্যাতন ও নিপীড়নের যাতাকলে পিষ্ট সমগ্র মানবজাতি, বিশেষত মুসলিম উম্মাহকে উদ্ধার করা [৫৩]। মানুষের দাসত্ব থেকে এক

كلمة الاخلاص و تحقيق معناها কিতাবে ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহি. [১০৭-১৯৮হি.] থেকে নকল করেছেন যে—

মানুষকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সঙ্গে পরিচিত করার চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত আল্লাহ তাআলা কাউকে দান করেন নি। দুনিয়াবাসীদের জন্য ঠাণ্ডা পানি যেমন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জান্নাতিদের জন্য তেমন। এ কালিমার জন্যই শান্তিনিবাস ও শান্তির ঘর তৈরি করা হয়েছে। এর প্রয়োজনেই রাসুলগণকে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি তা পাঠ করল, সে তার জান-মাল নিরাপদ করে ফেলল। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করল, তার জান-মালের নিরাপত্তা থাকল না। এ কালিমা জান্নাতের চাবি এবং রাসুলগণের দাওয়াতের কুঞ্জি।

৫৩. পুরো বিশ্ব সংশোধন করা, মুসলিম উম্মাহকে ভয়ংকর ট্রাজেডি থেকে মুক্ত করা এবং তাদেরকে নিরাপত্তা ও শান্তির চাদরে আগলে রাখার একমাত্র পথ ইসলামি ইমারা বা

খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। আর ইসলামি ইমারা অথবা সারা পৃথিবীব্যাপী খেলাফত প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ 'নববি দাওয়াত ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'। নিম্নে ইসলামি ইমারা অথবা খেলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কী, সে-বিষয়ে বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরব; কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে তার খণ্ডন এবং ইসলামি ইমারা বা খেলাফত প্রতিষ্ঠার আসল পথ ও তার প্রমাণ তুলে ধরব।

খেলাফত বা ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কী?

আমরা সকলেই রাসুল [সা.] এবং তাঁর সাহাবিদের পদাঙ্ক অনুসরণের দাবিদার। রাসুল [সা.] ও তাঁর সাহাবিরা এবং পরে আরো যেসকল মহামনীষী আগমন করেছেন, তারা সকলেই 'খেলাফত বা ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা' করেছেন। তারা ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক এবং শতাব্দির পর শতাব্দি ইসলামি আদলে পৃথিবী শাসন করেছেন। আর বর্তমানে আমরা যারা আছি, হয়তো কেউ গণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনীতির মাধ্যমে বা কেউ প্রচলিত ধারার দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে অথবা কেউ তাজকিয়াতুন নফসের মেহনতের মাধ্যমে মানুষদেরকে জাগ্রত করে—সকলেরই মূল উদ্দেশ্য বা টার্গেট কিন্তু 'খেলাফত বা ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা'। কুরআন ও সুন্নাহর আদলে দেশ পরিচালনা করা। প্রথম প্রজন্ম তো অল্প সময়ের ব্যবধানে 'খেলাফত বা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা' করেছে এবং শতাব্দির পর শতাব্দি কুরআন ও সুন্নাহর আদলে পৃথিবী শাসন করেছে। আর দ্বিতীয় প্রজন্ম তথা বর্তমান এ প্রচলিত ধারার প্রজন্ম, তারা তো যুগ-যুগ ধরে বা সামান্য সময়ের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পৃথিবীকে বা কোনো রাষ্ট্রকে শাসন করা তো দূরের কথা, তারা তো এখনো পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। অথচ তারা এ পথে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে, হেঁটেছে বহু দূর। কিন্তু সেই সুদীর্ঘ পথ আর শেষ হয় নি। আল্লাহ ভালো জানেন, কবেই বা তাদের সে সুদীর্ঘ পথ শেষ হবে!

সচেতন পাঠক! একটু গভীরভাবে খেয়াল করুন তো, এই দু-প্রজন্মের মাঝে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় পদ্ধতিগত আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। প্রথম প্রজন্ম তো আল্লাহর প্রেরিত পদ্ধতি 'দাওয়াত ও জিহাদের' পদ্ধতিতে হেঁটেছেন। তাই তারা ইসলামি শাসনব্যবস্থা পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। আর অন্য দিকে দ্বিতীয় প্রজন্ম আল্লাহর প্রেরিত পদ্ধতি 'দাওয়াত ও জিহাদের' পদ্ধতিতে হাঁটে নি। তবে হেঁটেছে ইসলামের চির দুশমন কাফিরদের বানানো গণতান্ত্রিক নির্বাচনী পন্থায় এবং নিজেদের আবিষ্কৃত বানানো পদ্ধতিতে।

'খেলাফত বা ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ 'দাওয়াত ও জিহাদ'। এ দাবির সপক্ষে প্রমাণসমূহ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

আল্লাহ বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন-ধর্ম পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতের ধারাও পূর্ণ করে দিলাম। আর

তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম'। [সূরা মায়িদা, আয়াত : ৩।]

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

আল্লাহ বলেন, 'আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।' [সূরা নাহল, আয়াত : ৮৯।]

সম্মানিত পাঠক! প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ইসলাম ধর্ম পূর্ণ হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআনে প্রত্যেক জিনিসের সমাধান রয়েছে। সুতরাং আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল, সব কিছুর মৌলিক সমাধান ইসলামের মধ্যে আছে। খেলাফত-ব্যবস্থা ও ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের সমাধান ইসলামে থাকবে না—এটা হতেই পারে না! অথচ খেলাফত ও ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকলে পৃথিবীব্যাপী পূর্ণাঙ্গভাবে কুরআন ও সুন্নাহর আইনই বাস্তবায়ন হবে না। আর যদি খেলাফত বা ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইম্মাতুল কুফরদের তৈরি গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচনের আশ্রয় নিতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে 'ইসলাম' ধর্ম এখনো পরিপূর্ণ হয় নি।

পাঠক! আল্লাহ তাআলা কি রাসুল [সা.]-কে আমাদের জন্য পরিপূর্ণরূপে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার আদেশ করেন নি। তিনি কি আমাদের জন্য জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আদর্শ নন? তাহলে কীভাবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বের হয়ে আব্রাহাম লিংকনের নির্বাচন-পদ্ধতি গ্রহণ করা বৈধ হতে পারে? তাছাড়া যেখানে কাফিরদের সাথে চাল-চলন, আচার-আচরণ এবং আখলাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য অবলম্বন করা নিষেধ, সেখানে দীন প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবের ক্ষেত্রে কাফির এবং আল্লাহর দুশমনদের তৈরি গণতান্ত্রিক নির্বাচন-পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে কিতাল-যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (শিরক) দূরীভূত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ ইবাদত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়।' [সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৯।]

সচেতন পাঠক! এ আয়াতে কি আল্লাহ তাআলা দীন প্রতিষ্ঠার 'পদ্ধতি'র কথা বলেন নি? দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও ইবাদত এবং শিরক দূরীভূত হওয়া 'নববি মানহাজের দাওয়াত ও কিতাল' ছাড়া অন্য কোনো পথ কি আছে? 'নববি মানহাজের দাওয়াত ও কিতাল-জিহাদ' ছাড়া পৃথিবীব্যাপী পূর্ণাঙ্গ দীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ কোনো দিন শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না।

আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনা। সর্বোপরি আমরা যেন আল্লাহর সাহায্যে সরল-সঠিক পথের ওপর চলতে পারি এবং তাতে অটল-অবিচল থাকতে পারি—এটাই আমাদের জিহাদি মিশনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আর আমরা সেই কুখ্যাত ইহুদিজাতি বনি ইসরাইলের মতো 'তিহ' ময়দানে পদার্পণ করা এবং তাতে ঘোরাফেরা করতে একেবারেই অপ্রস্তুত। কখনো আমরা এমনটা করব না, ইন শা আল্লাহ।

বিগত আলোচনা এবং পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যেসব কিতাবের সাহায্য নিয়েছি, উপকৃত হয়েছি, সেগুলোর অন্যতম শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ'র লিখিত কিতাব *'কিতাবুল ঈমান'*, শাইখ আবদুর রহমান ইবনু হাসান আলুশ শাইখ রাহিমাহুল্লাহ'র কিতাব *'কিতাবু ফাতহিল মাজিদ'* এবং শাইখ মুহাম্মাদ কুতুবের লিখিত কিতাব *'কিতাবুল মাফাহিমি ইয়ানবাগি আন-তুসাহহিহা'*।

এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, বর্তমান মুসলিম-নামধারী শাসকরা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম; তারা প্রায় প্রতিটি কাজেই খিয়ানতের পরিচয় দিচ্ছে। ইসলামের সঠিক ও শক্তিশালী পথে তারা নিজেরা তো চলছেই না, এমনকি মুসলিম উম্মাহকেও এর ওপর পরিচালনা করছে না; বরং তারা চলছে নিজেদের খেয়াল-খুশি ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে। এটাই হলো বিগত যুগগুলোতে মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের মৌলিক কারণ। পাশাপাশি আমাদের সামনে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, বর্তমান মুসলিম উম্মাহর ওপর আপতিত লাঞ্ছনা ও অধঃপতনের একমাত্র সমাধান—আল্লাহ-প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ দীন ও জীবনব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরা। জীবনের প্রতিটি অঙ্গন তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরিয়াকে বাস্তবায়ন করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করা। পূর্ণাঙ্গ দীন ও শরিয়তকে

আমালুল মুতাওয়ারিস তথা রাসুল [সা.], সাহাবায়ে কেরামদের প্রজন্ম এবং তৎপরবর্তী প্রজন্মগুলোর কর্মপদ্ধতি বিরাট বড় দলিল। তারা কীভাবে খেলাফত বা ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা আমাদের দেখার বিষয়। তাদের কর্মপদ্ধতিতে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম পাথেয় এবং বিজয়ের নিশানা।

ইসলামি ইতিহাসও এ ক্ষেত্রে জ্বলন্ত প্রমাণ। ইতিহাস তো বলে, দীন যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে 'নববি মানহাজের দাওয়াত ও জিহাদের' মাধ্যমেই।

ধারণ করার কারণে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী মুসলিম উম্মাহকে বিগত শতাব্দিগুলোতে সম্মানের জিন্দেগি দান করেছেন; আবৃত করেছেন নিরাপত্তার চাদরে। তাছাড়া বর্তমান মুসলিমজাতির এ কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হলো, শক্তিশালী নিরাপদ এক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, যা আমাদের মাঝে পূর্ণাঙ্গ কুরআনকে বাস্তবায়ন করবে এবং বাস্তবিক অর্থেই জিহাদের পতাকাকে উড্ডীন করবে। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ [আলিম-ওলামা, জাতির কর্ণধার, বিশিষ্ট ও প্রধান ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যবসায়িক ব্যক্তিগণ] একে অপরকে আহ্বান করে এ সকল ধ্বংসাত্মক সংস্থাগুলোর ছত্রছায়া থেকে বহু দূরে নির্জন-নিরাপদ স্থানে সমবেত হবে।

তাদের মানহাজ বা কর্মপদ্ধতি হবে আল্লাহর কুরআন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ। আর এই দলটির সদস্যবৃন্দ মুসলিমজাতির এই ক্রান্তিলগ্নে, সমগ্র কঠিন পরিস্থিতিতে তাদেরকে প্রাধান্যযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ, উত্তম বিষয়াদির দিকে ডেকে আনবে; তাদেরকে সেদিকে ধাবিত করবে। তাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হবে; যাতে মুসলিম উম্মাহ নিজেরাই স্বহস্তে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক কালিমার পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে, মুসলিমদেরকে জিহাদ ও জিহাদের প্রস্তুতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে, মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র পৌঁছানোর পথকে সহজ করবে। বিশেষত হালকা গড়নের অস্ত্রশস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র ও ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন এবং ইরাকে রুমীয় খ্রিষ্টানরা যে বিশ্বাসঘাতকতা ও গাদ্দারি শুরু করেছে, তা বন্ধের লক্ষ্যে 'নফিরে আম' তথা ব্যাপকভাবে জনসাধারণদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা। আল্লাহই ভালো জানেন তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা ও গাদ্দারির শেষ কোথায়? তবে বাস্তবতা হলো, মুসলিম উম্মাহ যখন কুরআনকে আঁকড়ে ধরে নববি পদ্ধতির দাওয়াহ ও জিহাদের পতাকা নিয়ে সম্মুখপানে ছুটে চলবে, তখন সফলতা তাদের পদচুম্বন করবেই। কারণ, মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আর তিনি কতই-না উত্তম কর্মবিধায়ক।

হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা! আমাদের সমগ্র মুসলিম উম্মাহর এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা খুবই জরুরি যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের মুক্তি ও

সৌভাগ্য পূর্ণাঙ্গ ইসলাম ও জিহাদ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই অর্জিত হবে। এ দুটোকে কেন্দ্র করেই ঘুরতে থাকবে আমাদের মান-ইজ্জত ও সৌভাগ্যের চাকা। যেমনটি ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ তার সুনানের সহিহ হাদিসে বর্ণনা করেছেন—

হজরত ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল [সা.]-কে বলতে শুনেছি, 'যখন তোমরা 'ইনা' নামক সুদি কারবার করবে, গরুর লেজ ধরবে, কৃষি কাজ নিয়ে খুশি থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। আর তিনি তোমাদের থেকে এই লাঞ্ছনা দূর করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীনের তথা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে।' [*সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ৩৪৬২; সহিহ হাদিস।]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত আবু ওবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আর আমরা যখনই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে ইজ্জত-সম্মান সন্ধান করেছি, তখনই আল্লাহ আমাদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেছেন।' [*মিনহাজুল কাসিদিন* : ১৩৯; সহিহ হাদিস।]

সংশোধনের পথের আহ্বায়কদের এ বিষয়টি জানা অতিব জরুরি যে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে সংশোধন করার পথ—তাদেরকে এক কালিমা তথা কালিমাতুত তাওহিদের পতাকাতলে সমবেত করা। তাত্ত্বিক ও চিন্তানৈতিক লেকচার এবং কিতাবাদি রচনা করা—এতটুকু দ্বারা কখনো মুসলিম উম্মাহর সংশোধন হবে না। তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে কখনো এ ধরণীতে বসবাস করতে পারবে না; বরং মুসলিম উম্মাহর জন্য আবশ্যক হলো, একটি কার্যকর শরিয়তসম্মত সংগঠন প্রস্তুত করা, যাতে গোটা মুসলিম উম্মাহই সামর্থ্য অনুপাতে এর সদস্য হবে; এতে অংশগ্রহণ করবে। এ সংগঠন-যাত্রার শুরুভাগটা হবে আল্লাহর প্রতি দোয়া ও অনুনয়-বিনয়ে; আর শেষটা হবে, আল্লাহর রাস্তায় কিতালের মাধ্যমে। আল্লাহর রাস্তায় কিতাল তথা কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ পরিচালনা করা আমাদের ইসলাম ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; বরং এটি তো ইসলাম ধর্মের শীর্ষচূড়া। আর শীর্ষচূড়া ছাড়া কীভাবে দীন-ইসলাম টিকে থাকবে? জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

তো মুসলিম উম্মাহর জীবন, তাদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা ও পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

ইতিহাসের পাতা একটু উল্টিয়ে দেখুন, মুসলিম উম্মাহর সর্বাধিক ভয়ংকর দুশমন আইম্মাতুল কুফর সন্ত্রাসী আমেরিকা এইমাত্র কয়েক-দশকের ব্যবধানে পুরো পৃথিবীব্যাপী কয়েকদশক যুদ্ধের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছে। এটা শুধু এমনিই কোনো লক্ষ্য ছাড়া তারা করে নি। মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র, কূট-কৌশল ও হীন স্বার্থ বাস্তবায়নে তাদের এ ধরনের ভয়ংকর যুদ্ধের দামামা পৃথিবীব্যাপী চালু রাখাটা খুবই আবশ্যকীয় একটি বিষয়।

বলাবাহুল্য যে, কয়েক যুগ আগে মার্কিনি জাতিসংঘ গোটা বিশ্বে যুদ্ধ-পরিস্থিতি বন্ধের লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। আর তারা সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে তো পারেই নি; বরং উল্টো, এই তো সেদিন থেকে জাতিসংঘের মাঝে ফাটল ও অনৈক্য শুরু হয়েছে। আল্লাহ চাহে তো এটা সবর্দা থাকবে।

সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! তোমরা সতর্ক হও। বাস্তবতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। ধোঁকাবাজ ও প্রতারকের প্রতারণা[৫৪] থেকে বেঁচে থাকো। যারা

৫৪. **মানবজাতির প্রতি শয়তানের শত্রুতা পর্যায়ক্রমে সাত স্তরে প্রকাশ লাভ**

শয়তান মানবজাতির প্রকাশ্য ও চিরশত্রু। শয়তানের চেলাচামুণ্ডা ও সাঙ্গপাঙ্গরাও মানবজাতির প্রকাশ্য ও চিরশত্রু। তারা ছলে-বলে-কৌশলে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলে মানবজাতিকে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে তারা দীন-ইসলামের মৌলিক কাজ থেকে বিরত রাখছে। এখন জানা দরকার শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কূটকৌশল ও কুটিল ষড়যন্ত্র কোন পদ্ধতিতে প্রকাশ পায়। তারা কীভাবে মানুষদেরকে সঠিক পথ থেকে পথহারা করে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহি. বলেছেন, মানুষের প্রতি শয়তানের শত্রুতা পর্যায়ক্রমে সাত স্তরে প্রকাশ লাভ করে। সংক্ষেপে তার কথাগুলো এখানে পেশ করছি, যাতে আমরা শয়তানের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারি এবং তা থেকে বাচঁতে পারি—

১. কুফর-শিরক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে শত্রুতা করার মাধ্যমে। শয়তান যখন এগুলোর কোনো একটাতে কাউকে লিপ্ত করাতে পারে, তখন তার কান্না থেমে যায় এবং সে তার ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম নেয়। যখন সে এর মাধ্যমে সফলতা লাভ

করে, তখন সে তাদেরকে নিজ বাহিনীর সদস্য মনে করে। ফলে তারা হয়ে যায় ইবলিসের পথে আহ্বানকারীদের একজন। আর যদি এগুলোর মাধ্যমে কাউকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারে, তখন দ্বিতীয় পদ্ধতি বা স্তরের আশ্রয় নেয়।

২. বিদ'আহ তথা কারো মাধ্যমে দীনের নামে দীনের মধ্যে নতুন কোনো কাজ আবিষ্কার করানো বা কাউকে তাতে লিপ্ত করা। শয়তানের কাছে কাউকে প্রকাশ্য খারাপ কাজে এবং অবাধ্যতায় লিপ্ত করানোর চেয়ে দীনের নামে নব উদ্ভাবিত কাজ আবিষ্কার করানো বা তাতে লিপ্ত করা বেশি পছন্দনীয়। এ বিদয়াতের ক্ষতি মূল দীন-ধর্মের মধ্যে প্রভাব ফেলে এবং তার ক্ষতিটা ব্যাপক। আর বিদয়াত মূলত রাসুল [সা.] কর্তৃক সত্য দাওয়াতের বিপরীত একটি দাওয়াত। যখন শয়তান এ পদ্ধতিতে নিরাশ হয়ে যায়, তখন তৃতীয় পদ্ধতির আশ্রয় নেয়।

৩. বিভিন্ন ধরনের কবিরা গুনাহে লিপ্ত করানোর মাধ্যমে। শয়তান কামনা করে মানুষ কবিরা গুনাহে লিপ্ত হোক। বিশেষত কোনো অনুসরণীয় আলিমকে, যাতে মানুষ তার থেকে দূরে সরে যায়।

৪. সগিরা গুনাহে লিপ্ত করানোর মাধ্যমে। যখন কেউ পর্যাপ্ত পরিমাণ সগিরা গুনাহ করে, তখন এই সগিরা গুনাহই তাকে ধ্বংস করে ফেলে। যখন এর মাধ্যমেও বিফল হয়, তখন পঞ্চম পদ্ধতির দিকে যায়।

৫. মুবাহ তথা যাতে সওয়াবও নাই শাস্তিও নাই এমন কাজে লিপ্ত করানোর মাধ্যমে। শয়তান কর্তৃক কাউকে মুবাহ কাজে লিপ্ত করানোর ক্ষতি ও পরিণতি হলো, সে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আখিরাতে প্রভূত কল্যাণ ও সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া। যখন শয়তান এখানেও ব্যর্থ হয়, তখন ষষ্ঠতম পদ্ধতির আশ্রয় নেয়।

৬. তুলনামূলক বেশি ফজিলতপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রেখে কম ফজিলতবিশিষ্ট কাজে ব্যস্ত করে রাখা। শয়তান এর মাধ্যমে তাকে উৎকৃষ্ট কাজ থেকে এবং মহামূল্যবান সম্পদ ও ফজিলত থেকে বঞ্চিত রাখে। যখন শয়তান এ পথেও নিরাশ হয়ে যায়, তখন সপ্তম পদ্ধতির আশ্রয় নেয়।

৭. যখন শয়তান উল্লিখিত ছয়টি স্তরের মাধ্যমে কাউকে সঠিক পথ থেকে পথহারা করতে নিরাশ হয়ে যায়, তখন শয়তান তার বাহিনী তথা মানব ও দানবকে তার ওপর লেলিয়ে দেয়। তারা তাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন কষ্ট দেয়। বাহ্যিক কষ্ট হলো, তার বাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন বাহানায় তাকে প্রহার করা হয়। এমনকি তাকে অনেক সময় হত্যা করা হয়। আর অভ্যন্তরীণ কষ্ট তথা যা দেখা যায় না তা হলো, শয়তানের বাহিনীগুলো সঠিক পথের পথিককে কাফির, পথভ্রষ্ট ও বেদায়াতি বলে আখ্যায়িত করে এবং তার থেকে মানুষদেরকে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করে। যাতে মানুষরা তার থেকে উপকার লাভ করতে না পারে। *[আল-ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম।]*

সচেতন পাঠক! এ কথাগুলো কি আজ আমাদের জীবনের জ্বলন্ত বাস্তবতা নয়? আমরা কি বর্তমানে ব্যাপকভাবে শয়তানি বাহিনীর কুটিল ষড়যন্ত্রের নাগপাশে বন্দি নই? হ্যাঁ, অবশ্যই। বিশেষভাবে এখন আমি শেষ তিনটি কূট-কৌশল নিয়ে সংক্ষিপ্ত

আলোচনা করব। একটু চিন্তা করে দেখুন তো, আমরা কী পরিমাণ অনর্থক কাজে লিপ্ত! প্রাত্যহিক আমরা অহরহ এমন কাজ করছি, যাতে কোনো উপকার নেই। থাকলেও যৎসামান্য। যার ফলে আমাদেরকে শয়তান ও তার দোসররা দুনিয়াবি ও পরকালের প্রভূত কল্যাণ থেকে মাহরুম করছে। আর শেষ যে কূট-কৌশলটি আছে, তাতে তো দীনের ধারকবাহক আলিম-ওলামা এবং তালিবুল ইলমরা ব্যাপকহারে লিপ্ত। আমরা বিভিন্ন ধরনের দীনি কাজে বা দীনের নামে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত। তাতে নিয়মিত প্রচুর সময় ব্যয় করছি। তবে ভাবার বিষয় হলো, সে কাজগুলো শরিয়তের মানদণ্ডে কোন স্তরের। আর তখনই শরিয়তের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর কোন হুকুম বর্তায়। আল্লাহ না করুন, যদি আমরা নিয়মিত পর্যাপ্ত সময় নফল, মুস্তাহাব ও মুবাহ পর্যায়ের কাজে ব্যয় করি আর ওই সময়েই শরিয়তের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর ফরজ কোনো বিধান বর্তায়, তাহলে নিশ্চিত মনে করতে হবে আমরা শয়তানের বাহিনীর ষড়যন্ত্রের শিকার। এ কারণে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। হে আল্লাহ! শরিয়তের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর যে সময় যে হুকুম বর্তায়, তার ওপর শতভাগ আমল করার তাওফিক দান করুন। আর শেষ যে কূট-কৌশলটি আছে, সেটা তো শয়তানের অনুসারীদের বড় এক হাতিয়ার। শয়তানের বাহিনীরা হকপন্থিদেরকে কাফির, পথভ্রষ্ট ও বিদ'আতি ইত্যাদি তথাকথিত খেতাবে আখ্যায়িত করে। যাতে মানুষরা তার থেকে উপকার অর্জন করতে না পারে। বর্তমানে যারা কুরআন ও সুন্নাহর কথা কোনো রকমের বিকৃতি সাধন ছাড়া উম্মতের কাছে পৌঁছায় এবং শরিয়তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঈমান-আকিদা, জিহাদ ও খেলাফত বিষয়গুলো কোনো ধরনের বিকৃতি সাধন ছাড়া সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, তখন তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। তাদের সুরে তাল মিলায় কতক দরবারি মোল্লা এবং হকের দাবিদার কতক আলিম ও তালিবুল ইলমও। সাবধান! কারো বিষয়ে কোনো কথা বলার আগে এবং তার কোনো বক্তব্যকে রদ বা প্রত্যাখ্যান করার আগে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তার কথাগুলো গভীরভাবে যাচাই করতে হবে। যাচাই করার পর যদি তার কথাগুলো কুরআন ও সুন্নাহ-বিরোধী মনে হয়, তাহলে আপনার ওপর আবশ্যক হলো, তার বক্তব্যকে দলিল-প্রমাণের আলোকে খণ্ডন করে, সঠিক কথাগুলো দলিল-প্রমাণের আলোকে উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করা। আর যদি তার বক্তব্য সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে কোনো ধরনের বাহানা না করে, কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত তার বক্তব্যকে মেনে নেওয়া এবং সে অনুপাতে জীবন অতিবাহিত করা।

আমরা নব্য মুরজিয়া হয়ে যাচ্ছি না তো?

'একজন ব্যক্তি যত বড় অপরাধ করুক না কেন তাকে কাফির বলা যাবে না'-এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রাখাটাও একটা শয়তানি বড় ধোঁকা। নিম্নে বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

শান্তির দাওয়াতের নামে তোমাদেরকে অস্ত্র ফেলে দিতে বলে, তাদের এ দাওয়াহ ও আহ্বানকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করো; তাদের থেকে শতভাগ দূরত্ব বজায় রাখো।

এক শ্রেণির লোক আছে যারা মনে করেন যে, যারা বেশি বেশি ঈমান-কুফর নিয়ে আলোচনা করেন, তার প্রতি মানুষদের উৎসাহিত করেন এবং আকিদা বিষয়ে কথা বলেন, তারা খারেজি। এমনকি আমার কতক ভাই এ ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন।

এ শ্রেণির লোকগুলো ভুলে গেছে যে, একজন মুমিন-মুসলিমকে কাফির বলা যেমনিভাবে জঘন্যতম অপরাধ ঠিক তেমনিভাবে কোনো কাফির, নাস্তিক ও মুরতাদকেও মুসলিম বলা জঘন্যতম ও ভয়ংকর অপরাধ। এরা এ মূলনীতিটির প্রথমাংশ তো ভালোভাবেই স্মরণ রেখেছে; কিন্তু দ্বিতীয়াংশটি ভুলে যাওয়া নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করেছে। এ শ্রেণির লোকগুলো 'খারেজি' হওয়ার অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের অজান্তে কখন যে 'মুরজিয়া'দের কাতারে ঢুকে পড়েছে, তা তারা উপলব্ধি করতে পারে নি। মনে রাখবেন, খারেজিরা সুস্পষ্ট কুফরি আকিদা-বিশ্বাস কিংবা কুফরি কথা বা কর্মের কারণে কাফির ও মুরতাদ হওয়া ব্যক্তিদের কাফির ও মুরতাদ বলার কারণে খারেজি হয় নি; বরং তারা খারেজি হয়েছে, কবিরা গুনাহে লিপ্ত মুসলিমকে কাফির ও মুরতাদ বলার কারণে। সুস্পষ্ট কুফরি আকিদা-বিশ্বাস কিংবা কুফরি কথা বা কার্মের কারণে কাফির ও মুরতাদ হওয়া ব্যক্তিদের কাফির ও মুরতাদ বলার কারণে যদি খারেজি হতে হয়, তাহলে এ শ্রেণির খারেজিদের খাতায় সর্বপ্রথম নাম আসবে প্রথম খলিফা আবু বকর [রা.] এবং আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম ও মহান মনীষীদের নাম। এজন্য এ শ্রেণির ভাই ও বন্ধুদের প্রতি আকুল আবেদন থাকবে, কাউকে 'খারেজি কিংবা তাকফিরি বা তাকফিরের প্যাকেজ নিয়ে থাকে' এ ধরনের খেতাবে সম্বোধন করার আগে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা এবং যাচাই করবেন, তিনি যাকে কাফির বলেছেন, কোন কারণে কাফির বলেছেন? কারণটা ঈমান ভঙের কাতারে পরে কি-না? তাই আমার বন্ধুদের প্রতি আবেদন থাকবে, আপনারা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামি আকিদা শিক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করুন। যার ফলে নিজের ঈমান এবং মুসলিম উম্মাহর ঈমানকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন।

বি.দ্র. 'মুরজিয়ারা' কোনো মুসলিমকে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফির ও মুরতাদ বলা তো দূরের কথা; এমনকি তারা সুস্পষ্ট কুফরি কথা বা কার্মের কারণে কাউকে কাফির ও মুরতাদ বলেন না। তাদের কাছে কেউ মৌখিকভাবে নিজেকে মুসলিম দাবি করলেই সে খাঁটি মুমিন হয়ে যায়। তার বাহ্যিক আমল যা-ই হোক না কেন।

সচেতন পাঠক! তাদের এ বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিপরীত এবং একেবারেই অযৌক্তিক। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে যা আমরা বুঝতে পেরেছি।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, তাদের এ আহ্বানের লক্ষ্য—কাফিরদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। তারা কামনা করে, আমরা যেন কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ছেড়ে দিই এবং তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করি। আর এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, যারা মুসলিম উম্মাহকে এ ধরনের দাওয়াহ ও আহ্বান করে, তারা হয়তো মূর্খ নয়তো মুনাফিক।

সবশেষে আমি বলতে চাই, মুসলিমজাতির তরুণপ্রজন্ম সিংহ-শার্দুলদেরকে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করছি। বিশেষত ফিলিস্তিন ও ইরাকের মুসলিমদের প্রতি আমার এই আহ্বান। আর আমি নিজেকে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বনের ওসিয়ত করছি এবং আমি আরো নসিহাত করছি, তোমরা সমগ্র মুসলিমজাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শত্রুর বিরুদ্ধে অধিক শক্তি সঞ্চয় করো। আমরা জিহাদের ময়দানে কাফিরদের বিরুদ্ধে ধৈর্যধারণ ও তাকওয়ার বিনিময়ে আল্লাহর সাহায্যের আশাবাদী। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ধৈর্যশীল ও মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত করো।

পরিশেষে সর্বস্থানে অবস্থানরত মুসলিম তরুণ সিংহশাবকদেরকে লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু কথা বলব। আর এগুলো আমি তোমাদের পূর্বপুরুষ, যারা ফিলিস্তিন-ভূখণ্ডে বেড়ে ওঠেছে, দীর্ঘকাল যাবৎ বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী—তাদের থেকে শ্রবণ করেছি। ফিলিস্তিনের মুসলিমদের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের সামনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে কয়েক দশক উদ্যোগ ও সম্মেলন। কিন্তু আজও সেই অসহায় ফিলিস্তিনি মুসলিম ভাই-বোনদের ভাগ্যে জুটে নি ছিটেফোঁটা শান্তি ও নিরাপত্তা! সুতরাং আমি তোমাদের সামনে এ বিষয়টি নিয়েই খুব সংক্ষিপ্তাকারে একটি কসিদা (কাব্য) পেশ করছি।

হে আমার প্রিয় সন্তান! দুনিয়া-প্রেমিকরা তোমাকে অচিরেই শান্তির কথা বলবে। তোমাকে ডাকবে শান্তির পথে। সাবধান, কখনো তুমি এ কথার প্রতি কর্ণপাত করবে না। এ হলো তথাকথিত শান্তির ডাক; বস্তুত তারা তোমাকে ডাকছে ধ্বংসের পথে।

আল্লাহই সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার জগতে দান করো কল্যাণ এবং পরকালেও। আর মুক্তিদান করো আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কামনা করছি, তুমি পৃথিবীর বিভিন্ন দিকপ্রান্তে অবস্থানরত মুজাহিদিনে কেরামের কদমকে সুদৃঢ় রাখো। বিশেষ করে ফিলিস্তিন, ইরাক, কাশ্মির, শিশান ও আফগানিস্তানের মুজাহিদদের।

হে আল্লাহ! তুমি শত্রুদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের নিক্ষেপণকে সঠিক করে দাও, মজবুত করে দাও তাদের অন্তর, তাদের পরস্পরের মাঝে মিল-মুহাব্বত সৃষ্টি করে দাও, তোমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রসারিত করো সাহায্যের পথ এবং তাদেরকে সাহায্য করো তোমার ও তাদের শত্রুর ওপর। কেননা, হে মহা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী! তাদের সাহায্যকারী কেবল আপনিই।

হে আল্লাহ! তুমি এই উম্মাহর মধ্যে হিদায়াত ও সুপথ অবধারিত করে দাও; যে পথে আপনার অনুসারীরা সম্মানিত হয় আর আপনার অবাধ্যরা হয় লাঞ্ছিত ও অপদস্থ; যেখানে করা হয় সৎকাজের আদেশ আর বাধা প্রদান করা হয় অসৎ কর্ম থেকে।

শেষ কথা, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। সর্বশেষ নবীর ওপর বর্ষিত হোক রহমত ও শান্তি।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন

পূর্বে শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ'র একটি 'মুহাজারা' তথা ভাষণ যা পরে কিতাবাকারে লেখা হয়েছে, তার অনুবাদ ও কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টীকা সংযোজন করা হয়েছে। আর এখন জিহাদি কয়েকজন শাইখের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নসিহাত বা উপদেশ সংযোজন করেছি, হয়তো সেগুলো কোনো জিহাদপ্রেমী ভাইয়ের উত্তম ও কার্যকরী পাথেয় হবে; সঁপে দেবে আল্লাহর রাহে তাঁরই প্রদত্ত জান ও মাল; বিনিময়ে কুড়িয়ে নেবে, বরং করে নেবে নিজের ভাগ্যে জান্নাতে তার আবাসস্থল।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহর বাণী

নিশ্চয়ই সবচে' নিকৃষ্ট ব্যবসায়ী হচ্ছে ওই সকল লোক যারা নিজের ও অনুসারীদের দীন নিয়ে ব্যবসা করে। সুতরাং তারা এই দীনকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে, এতদসত্ত্বেও এতে তারা সুখী হয় না। এবং ইসলামের সিংহরা তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিদান স্বরূপ ও তৎসদৃশ লোকদের (এই ধরনের অপরাধ) থেকে বিরত রাখার উদ্দেশে দ্রুত হত্যা করেন। *[আলজামে লি কালিমাতিশ শাইখ উসামা]*

বাস্তব পদক্ষেপ

যদি সম্ভব হতো তাহলে সর্বদাই আমি তোমাদেরকে মূল টার্গেট সম্পর্কে বর্ণনা করতাম। তা হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর অর্থ ও দাবি অনুযায়ী আমল করা এবং ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদ সম্পর্কে। যাতে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হও। কারণ, বর্তমানের মুসলিমদের দুরাবস্থা ইলম বা

কিতাবের অভাবে নয়। আল্লাহর অনুগ্রহে ইলম এখন প্রসারিত; বরং অধঃপতনের কারণ হচ্ছে, আমাদের ইয়াকিন, বিশ্বাস, সততা ও আমানত দুর্বল হওয়ায় আমরা ইলম অনুযায়ী আমল থেকে সরে পড়েছি। অতএব এ দীন আমাদের সময় ও সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে না; বরং এ দীন প্রতিষ্ঠিত হবে তরবারির ছায়াতলে অবস্থানের মাধ্যমে। সুতরাং সুসংবাদ তাদের জন্য যারা এ মাসআলা বুঝেছে; ফলে রহমত ও যুদ্ধের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং শহিদ হয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট আশাবাদী যে, তিনি তাদেরকে শহিদ হিসেবে কবুল করে নেবেন।

পবিত্র রামাদানের আগমনে মোবারকবাদ

হে মুসলিম উম্মাহ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। পবিত্র রামাদান আগমন উপলক্ষে আপনাদের জানাই অভিনন্দন। এই রামাদান হচ্ছে, কুরআনের মাস, সাধনা, দীর্ঘ কিয়াম, সাদাকা ও জিহাদের মাস। তাই আমরা এই মাসে ইবাদতে মগ্ন থাকব এবং যা আল্লাহর স্মরণে বিঘ্নতা ঘটায় তা থেকে বেঁচে থাকব।

ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত মানহাজ

ইসলাম এমন মানহাজ যাকে নাজিল করা হয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ তা পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করার জন্য। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ, যা খণ্ডিত হবার নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝﴾

'তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য পূর্ণ দীন কায়েম হয়। যদি তারা কিতাল থেকে বিরত থাকে তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ দেখেন। [সূরা আনফাল : ৩৯।]

যে কিতাবের কিছু অংশ মানে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করে, সে কুফরি করল। তার সালাত-সিয়াম কোনোটাই কাজে আসবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝﴾

‘তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান এনেছো আর কিছু অংশকে অস্বীকার করছো। তোমাদের মধ্যে যে-ই এমন করবে তার জন্য রয়েছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা-অপমান আর আখিরাতে তাকে ঠেলে দেয়া হবে কঠিন আজাবের দিকে। তোমরা যা করো আল্লাহ তাআলা সে-সম্পর্কে উদাসীন নন।’

দুই প্রতিবেশীর মাঝে কত-না পার্থক্য!

তোমরা খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের হত্যার জন্য এগিয়ে এসো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো। হয়তো বিজয় নয়তো শাহাদাতই আমাদের একমাত্র পথ। আমাদের থেকে যার সময় ঘনিয়ে আসবে সে-ই শহিদ হয়। ফলে তার পরিবার তাকে হারায়; কিন্তু তার রুহ যেমনটা রাসুল বলেছেন—

‘সবুজ পাখির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াবে। অতঃপর আল্লাহর আরশে ঝুলন্ত প্রদীপে ফিরে আসবে।’ [*সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ২৫২০।]

সুতরাং দুই প্রতিবেশীর মাঝে কত-না পার্থক্য! আল্লাহ তাআলা ও তার পরিবারের মাঝে।

ফিলিস্তিনকে সাহায্যের শপথ

আমরা ফিলিস্তিনের ওপর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইহুদিবান্ধব চুক্তিকে কখনই সম্মান করব না, যা হামাসের নেতৃবৃন্দ ও ইখওয়ানের কমান্ডাররা করে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছা, আমরা হামাস ও অন্যান্য সংগঠনের কমান্ডারদের হক থেকে ফিরে আসার বিরোধিতা করে সত্যবাদী মুজাহিদদের হাতে হাত রেখে ফিলিস্তিনকে নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত স্বাধীন

করার জিহাদ শুরু করেছি। সুতরাং রক্তের বিনিময়ে রক্ত এবং ধ্বংসের বিনিময়ে ধ্বংস। আমি কসমকে পুনরাবৃত্তি করছি, আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাদেরকে (ফিলিস্তিনকে) সাহায্য করব, যদিও সওয়ারির ওপর হামাগুড়ি দিতে হয় অথবা শাহাদতবরণ করব হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবের মতো।

তাগুত থেকে সম্পর্কচ্ছেদ তাওহিদের ভিত্তি

নিশ্চয়ই যারা গাদ্দার শাসকদের দিয়ে আমাদের বিচারব্যবস্থা মিটিয়ে দিতে চায়, তারা ধোঁকার রাজ্যে বাস করছে এবং উম্মাহকেও ধোঁকায় ফেলে রাখছে; তারা ঝুঁকে পড়ছে জালিম পথভ্রষ্টদের দিকে। তাদের প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, তারা অক্ষম ও অবাধ্য সম্প্রদায়। সুতরাং মুসলিমদের আবশ্যক হচ্ছে, তাদেরকে নাসিহা প্রদান করা। যদি তারা উপদেশ গ্রহণ না করে, তাহলে তাদেরকে সতর্ক করবে এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকবে। মুসলিমদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে এই সকল তাগুতদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, তাগুত থেকে সম্পর্কহীনতা কোনো নফল বিষয় নয়; বরং তা হচ্ছে তাওহিদের অন্যতম মূল ভিত্তি, যা ছাড়া কেউ মুমিনই হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝﴾

‘যে তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনল, সে এমন একটি মজবুত হাতল ধরেছে, যা কখনো ভাঙার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।’ [সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬।]

সতর্কতা আবশ্যক

ওই সকল দাজ্জালদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক ইসলামি দল বা জামাতের লেবাসে কথা বলে এবং মানুষদেরকে স্পষ্ট ধর্মত্যাগে শরিক হতে উদ্বুদ্ধ করে। যদি তারা সত্যনিষ্ঠ হতো তাহলে আল্লাহর দীনকে একমাত্র তার জন্যই পালন করত এবং মুরতাদ শাসক থেকে মুক্তি পাওয়াই হতো দিবানিশির একমাত্র চিন্তা। আমেরিকা ও তাদের

মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার প্রতি মানুষদেরকে প্রেরণা জোগাত। এতে যদি তারা অক্ষম হয়ে যেত, তাহলে অবশ্যই অন্তর দিয়ে ঘৃণা করত এবং মুরতাদদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অথবা তাদের কুফরি মজলিসে বসা থেকে দূরে থাকত।

জাহিলিয়াতের দীন

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, আর আইন প্রণয়নকারীদের অধিবেশন হচ্ছে জাহিলিয়াতের দীন। সুতরাং যারা আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বিষয়ে আমির অথবা ওলামা-কর্তৃক হালাল বানানোর ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করে, যেমন : বিধান রচনার বৈঠকে (পার্লামেন্টে) প্রবেশ করা অথবা আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার ক্ষেত্রে আনুগত্য করা (যেমন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ) তাহলে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

মুরতাদ ও কাফিরের গোলাম!

প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী, চাই সে হক হোক কিংবা বাতিল, অত্যাবশ্যকীয় হচ্ছে তার কাছে এমন অস্ত্রভাণ্ডার থাকা যার দ্বারা সে তার মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এটা কীভাবে সম্ভব যে, সে মুরতাদ শাসক ও সৈন্যদেরকে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত দেখেও শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা করবে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক চিন্তা এবং হক প্রতিষ্ঠা থেকে ব্যর্থ বা নিরাশ হওয়া। আমরা এখানে এমন কোনো শাসক নিয়ে আলোচনা করছি না যার মাঝে সামান্য ফিসক ও জুলুম রয়েছে। আমরা আলোচনা করছি, মুরতাদ ও কাফিরের গোলামদের নিয়ে। [প্রথমত মুসলিম ও বিশেষভাবে আরবদের প্রতি]

মাছের জন্যে পানি

জিহাদি তানজিমের জন্যে জনগণ হচ্ছে মাছের জন্য পানির ন্যায়। সুতরাং যেই আন্দোলন জনসমর্থন হারিয়ে ফেলবে, ধারাবাহিকভাবে তার প্রতিরোধশক্তি দুর্বল হতে থাকবে। ফলে সেই জামাত এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে।

শাইখ আবুল হাসান আল বুলাইদি রাহিমাহুল্লাহর বাণী

জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম!

এরা ওই সকল লোক যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে চলছে। সুতরাং তাদের এমন দৃঢ় অবস্থানের অধিকারী হতে হবে যাতে কোনো বস্তু ঈমান বা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয় থেকে টলাতে না পারে।

নেতা চলে যান, তিনি যত বড় নেতাই হোক না কেন। তিনি যদি নবীও হোন।

আর তাদের এ মজবুত অবস্থান তখনই তৈরি হবে যখন এ বিষয়ে প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞান আত্মস্থ করবে এবং তা অন্তরে গেঁথে নেবে।

আর গুরুত্বপূর্ণ একটি সরঞ্জাম হলো, মুসলিমগণ দীনের প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যখন কোনো একজন চলে যাবেন তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে যাবে। আর সাধারণ মুমিনদের চিন্তা-চেতনা থাকবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর পথে যথাসাধ্য জিহাদ করা। [*ইহমিল সিলাহাশ শহিদ*, মাশাইখুল জিহাদিস সালাসা : ১]

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহর বাণী

রাসুলের অনুসারীরা লড়াই করে তাওহিদের জন্য। আর যারা রাসুলদের মানহাজ থেকে পদস্খলিত, তারা বিপ্লব করে পুরাতন তাগুতকে সরিয়ে নতুন তাগুতকে প্রতিষ্ঠার জন্য। আর এরাই হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা মুসলিমজাতির আত্মত্যাগ নিয়ে খেল-তামাশা করে!

বর্তমান জিহাদে সফলতার সুসংবাদ

বর্তমান-বিশ্বে ইসলামি জিহাদ অতি নিকটবর্তী বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছে ইন শা আল্লাহ। আর তা হবে আল্লাহর ইচ্ছায় জিহাদের সব ময়দানে তাওহিদের দাওয়াত প্রচার ও তাওহিদের পতাকা উড্ডয়নের মাধ্যমে;

মুজাহিদ-দলের নেতা ও কমান্ডারদের দূরদর্শিতা, ফিকহ ও সঠিক উপলব্ধি প্রসারের মাধ্যমে। এখন আমরা প্রত্যহ এমন খবর শুনি যা আমাদের আনন্দিত ও উৎফুল্ল করে, প্রশান্ত করে হৃদয়; সুসংবাদ দেয় অতি নিকটবর্তী বিজয়, সাহায্য এবং তামকিনের (সুদৃঢ়করণ)। আর শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণ অথবা কিছু ফ্রন্টে মুজাহিদদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব লাভ বা মুজাহিদদের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া সুসংবাদের পথে অন্তরায় নয়।

শাইখ আইমান আজ-জাওয়াহিরি রাহিমাহুল্লাহর বাণী

মুসলিমজাতি আজ চরম বাস্তবতার মুখোমুখি। তারা দেখতে যাচ্ছে, যেসকল ইসলামি দল মুক্তির আশায় সেকুলারিজম, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল, যারা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সাথে নিজেদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল তারা দীন ও দুনিয়া দুটোই হারিয়েছে।

উম্মাহর কাছে আজ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সত্যিকার মুজাহিদ ও দাঈগণ যে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন তা যথার্থই ছিল।

তারা বলেছিলেন যে, দাওয়াত ও জিহাদের পথই হচ্ছে মুক্তির পথ; কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণিত পথ; বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃত পথ। তাই সত্যিকার মুজাহিদ ও দাঈগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহর সামনে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণনা করা। যাতে মানুষ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথে পরিচালিত হতে পারে। [*সিলসিলাতুর রবিউল ইসলামি* : ১]

মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব

মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব আবশ্যক, যদিও সে তোমার প্রতি অবিচার ও সীমালঙ্ঘন করে। আর কাফিরদের সাথে শত্রুতা আবশ্যক, যদিও সে তোমাকে দান করে বা সদাচার করে। কেননা আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাজিল করেছেন, যাতে পূর্ণ দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং মুহাব্বত শুধু একমাত্র আল্লাহর বন্ধুদের জন্য আর শত্রুতা তাঁর শত্রুদের জন্য। সম্মান তাঁর বন্ধুদের এবং লাঞ্ছনা তাঁর শত্রুদের। প্রতিদান তাঁর বন্ধুদের এবং শাস্তি

তাঁর শত্রুদের। অতএব যখন কোনো ব্যক্তির মাঝে ভাল-মন্দ, অবাধ্যতা-আনুগত্য ও সুন্নাহ-বিদ'আত একত্রিত হবে, তখন সে কল্যাণ অনুযায়ী বন্ধুত্ব ও প্রতিদান প্রাপ্ত হবে এবং অবাধ্যতা অনুযায়ী দুশমনি ও শাস্তির উপযুক্ত হবে।

দুটি বিপরীত সিদ্ধান্তের সম্মুখে

আমরা হয়তো আমেরিকা, ইহুদি, ফ্রান্স, রুশ ও হিন্দুদের শত্রুতা প্রতিহত করব; এবং তাদের গোলাম, যারা শরিয়ত থেকে বের হয়ে গেছে ও সম্মানের ওপর আঘাত হানছে, তাদের থেকে ভূমিকে পবিত্র করব। যাতে মুসলিমরা স্বাধীনতা ও সম্মানের সাথে জীবনপাত করতে পারে, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করতে পারে এবং ইসলামের দাওয়াত, ইনসাফ ও শুরাকে প্রসারিত করতে পারে। এটাই হচ্ছে পবিত্র নবীর সুন্নাহ বা পথ যা আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশনা দেবে এবং ত্যাগ, কুরবানি, বাহাদুরি ও আক্রমণের সুউচ্চ দৃষ্টান্ত পেশ করবে অথবা আমরা নম্রতা, আত্মসমর্পণ, পলায়ন করব আর যে-কোনো মূল্যে জেল থেকে বেরোনোর পথ খুঁজব। তারপর স্বার্থসিদ্ধি এবং পরিবার ও নারীদের দেখা-শোনায় মগ্ন হব এবং ক্রুসেডার, ইহুদি, গোয়েন্দা ও তাগুতদের জমিনের ফাসাদ সৃষ্টির ব্যাপারে নিশ্চুপ হয়ে যাব। ফলে তারা আমাদের ওপর দখল, হত্যা, লাঞ্ছনা ও দমন চালিয়ে যাবে এবং এক তাগুত থেকে অন্য তাগুতের শাসন উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। আর প্রত্যেক অবস্থার সাথে তার ফলাফল থাকবে সদা-সর্বদা চলমান।

সমাজ সংশোধনের মূলনীতি

সমাজ সংশোধনের তিনটি মূলনীতি। কুরআনের শাসন, মানবজাতি ও ভূমি-স্বাধীনতা। এগুলো জিহাদ, আক্রমণ, সংগ্রাম এবং শাহাদতবরণ ব্যতীত সম্ভব নয় এবং যাবৎ না আমাদের ভূমি থেকে দুশমনদেরকে বিতাড়িত করব ও জিহাদের মাধ্যমে অধিকার ফিরিয়ে আনব। শান্তিপূর্ণভাবে বা সম্পর্কের মাধ্যমে শত্রুরা কখনো ভূমি ছেড়ে যাবে না, আর ফাসাদ সৃষ্টিকারী কাফির-বেঈমানরা কখনো জিহাদ ছাড়া অপসারিত হবে না। আর কীভাবেই-বা জিহাদ ছাড়া অপসারিত হবে? অথচ তারাই পরিবর্তনের সমস্ত শান্তিপূর্ণ

মাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছে; বরং যারা তা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে তাদেরকে জেল-জুলুম, খুন-নির্বাসন করা হয়েছে। তারা তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের সত্যকণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে, আর সাজিয়েছে প্রত্যেক নির্বাচনে মিথ্যা নাটক। তৈরি করেছে তাদের পদলেহীদল, যারা তাদের নষ্টামিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তারা সংস্কার ও পরিবর্তনের সব দাওয়াহ্য় আক্রমণ করছে আর 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর আহ্বানকারীকে ফিতনা সৃষ্টিকারী খারেজি বলে থামিয়ে দিচ্ছে। আর অপর দিকে তারা উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে মুরজিয়া-মতাদর্শ।

কর্মপরিকল্পনা!

আমরা ইসলামের বিজয়ের প্রতি আগ্রহী প্রত্যেক মুসলিমের দিকে হস্ত সম্প্রসারিত করে আমাদের কর্মপরিকল্পনায় (উম্মাহর অধঃপতন থেকে মুক্তি) অংশিদার করি। যা গঠিত হয়েছে—তাগুত থেকে বারাআত (সম্পর্কচ্ছেদ) ও কুফফারের সাথে শত্রুতা এবং মুমিনদের মৈত্রী ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ওপর। ইসলামের প্রতি আগ্রহী প্রত্যেক ব্যক্তি এই কর্মপরিকল্পনায় সাচ্ছন্দে নিজের সর্বশক্তি ও চেষ্টাকে মুসলিমদের ভূমি উদ্ধার এবং ইসলামকে নিজ ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করে। অতঃপর সে তার দাওয়াহ্কে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেয়।

শাইখ আবু ফিরাস আস-সুরি রাহিমাহুল্লাহর বাণী

আমেরিকাকে যেভাবে ধ্বংস করা সম্ভব

রাশিয়া খুব গর্বের সাথে বলত যে, তাদের নিকট আমেরিকাকে ২৮০ বার ধ্বংস করার মতো শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র আছে; কিন্তু সে তা কর্যকর করতে পারে নি। বিপরীতে আমরা তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছি মাত্র একবার এবং আলহামদুলিল্লাহ সফলও হয়েছি।

প্রকৃত মুজাহিদিন এই বিশাল জানোয়ারকে (রাশিয়া) ধ্বংস করেছিল। আর এটা বিশ্বের মুসলিমদের মনে আশা ও জীবনের সঞ্চার করেছে।

মুসলিমরা যদি জিহাদ শুরু করে এবং মহৎ বিষয়সমূহ অর্জনের প্রত্যাশায় এই আকিদার ওপর বহাল থাকে, তবে নিশ্চয়ই তারা এটা করতে সমর্থ হবে। [*ইহমিল সিলাহাশ শহিদ*, মাশাইখুল জিহাদিস সালাসা : ১।]

শাইখ আনওয়ার আওলাকি রাহিমাহুল্লাহর বাণী

মডারেট ইসলাম

বর্তমানে আমেরিকা এমন ইসলাম চায় না যা উম্মাহর বিপদ-সংকট প্রতিরোধ করবে। তারা চায় না এমন ইসলাম যা আহ্বান করবে জিহাদের দিকে, শরিয়া শাসনের দিকে ও আল-ওয়ালা ওয়াল বারা (আল্লাহর জন্য শত্রুতা ও মিত্রতা)-এর দিকে। তারা চায় না ইসলামের এই দরজাগুলো খুলে যাক এবং মানুষকে এর দিকে আহ্বান করা হোক; বরং তারা চায় এমন ইসলাম যা হবে আমেরিকান, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, তথাকথিত শান্তিপ্রিয়, গৃহপালিত।

শাইখ ইব্রাহিম আর-রুবাইশ রাহিমাহুল্লাহর বাণী

শত্রুতা ও ধৈর্যধারণ

আমি পুরো বিশ্বকে দেখি তোমার সাথে শত্রুতা করতে, তোমার বিরুদ্ধে কথা বলতে; এমনটি তোমার দীনি ভাই, যাদের রক্ষার জন্যে দাঁড়িয়েছো এবং নিজেকে তাদের সাহায্যকারী বানিয়েছো। কতক তোমাকে কটাক্ষ করবে, দোষারোপ করবে, মিম্বার থেকে বিরোধিতা করবে। আবার কতক তোমার সাথে কথা ছেড়ে দেবে; তোমাকে সালাম দেবে না। কতকের অবস্থা হবে, তোমার বিপদে সে হবে আনন্দিত। তবে তোমার ব্যবহার হবে ওই ব্যক্তির মতো যে বলে, 'আমি তার জীবনাকাঙ্ক্ষী আর সে আমার মৃত্যুপ্রয়াসী'। এতদাসত্ত্বেও তুমি তোমার পথে অবিচল থাকবে। তিক্ততার ঢোক গিলবে, যেন তা খাঁটি মধু। এর ফলেই আল্লাহর ওলির বৈশিষ্ট্যে তুমি হবে উম্মাহর সবার উর্ধ্বে। (তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, কোনো

নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করে না) হবে তায়েফা মানসুরার (বিজয়ী দলের) গুণে গুণান্বিত। তাদের বিরোধী ও সাহায্য ত্যাগকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ এসে যায় (মৃত্যুবধি) ।

শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহর বাণী

ধৈর্য হচ্ছে, অবিচলতার ইন্ধন। আল্লাহ বলেছেন—

'তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম। যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত আর তারা আমার আয়াতসমূহে ছিল দৃঢ় বিশ্বাসী।'

সুতরাং ধৈর্য অবিচলতাকে আর বিশ্বাস আশাকে সম্প্রসারিত করে। হকের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ও 'দুনিয়াবি চাহিদা ধ্বংসে আফসোস ছেড়ে দেয়া' ছাড়া অন্তরের কোনো চিকিৎসা নেই। ইয়াকিন ও সবরের বেশি মুখাপেক্ষী হচ্ছেন দীনের পথের মুজাহিদ, ওলামা ও দাঈগণ। কেননা এ পথ হচ্ছে জীবনের শুরু হতে মৃত্যুবধি। রাস্তা হচ্ছে কষ্টদায়ক এবং পরীক্ষাপূর্ণ। জেনে রেখো, কখনো কষ্ট ছাড়া মর্যাদা হাসিল হয় না। আল্লাহ বলেন—

﴿اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلۡزِلُوۡا حَتّٰى يَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰى نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِيۡبٌ ۝﴾

'তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? অথচ তোমরা সে লোকদের অবস্থার মুখোমুখি হও নি যারা পূর্বে গত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছিল বিপদ ও কষ্ট। আর এমনভাবে শিহরিত হতে হয়েছে, যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তারা এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৪।]

জিহাদের প্রভাব

জিহাদের প্রেরণাশক্তি ও আন্দোলন ঈমানি দৃঢ়তা অনুযায়ী পরিবেশকে ঠিক করে দেয়। সুতরাং যখন হীনম্মন্য ও অপদস্ত জাতির মাঝে জিহাদের প্রাণ

ও প্রেরণা সঞ্চালন হবে, তখন জিহাদের মাধ্যমে লাঞ্ছনা পরিবর্তন হবে ইজ্জতে আর অপদস্থতা পরিণত হবে সম্মান ও মর্যাদায়। সম্মান ও সাফল্যবিশিষ্ট কোনো জাতির অস্তিত্বই সম্ভব নয় জিহাদের প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা ছাড়া। জিহাদের প্রেরণা তার প্রত্যেক শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হবে।

কখনোই সাহায্যপ্রাপ্ত হব না

নিশ্চয়ই আমরা রয়েছি এক মহাযুদ্ধ-ক্ষেত্রে। এখানে সর্বপ্রথম কৌশল হচ্ছে, আমাদের ওপর ফরজ যুদ্ধের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। যদি বাস্তবেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাতের আশা ও শরিয়াহর সাহায্যের ইচ্ছা করি, তাহলে যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানিত্বের সীমানার প্রত্যেককে একত্র করা আবশ্যক—ইসলামের গণ্ডিভুক্ত কোনো মতপার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া ব্যতীত। কেননা মুসলিম উম্মাহর শক্তি একত্র করা ব্যতীত এই লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

শাইখ ইউসুফ আল উওয়াইরি রাহিমাহুল্লাহর বাণী

শারীরিক প্রস্তুতি

যে যুদ্ধরহস্য সম্পর্কে অবগত এবং জিহাদের ময়দানে অবতরণ করে, সে বুঝবে যে, শারীরিক শক্তি ও উচ্চ দক্ষতা হচ্ছে আল্লাহর শত্রুকে আক্রমণ, পলায়ন এবং দুর্বলকরণ কৌশল, যা মুজাহিদদের ক্ষমতার অন্যতম ভিত্তি। এটা অকল্পনীয় যে, একজন স্থূলকায় স্বল্প দক্ষতার ব্যক্তি সঠিকভাবে যুদ্ধ-কৌশল ব্যবহার করতে পারবে। আল্লাহর ওপর সর্বোত্তম তাওয়াক্কুল হচ্ছে, সমস্ত মাধ্যম ও চেষ্টাকে ব্যয় করা। আর যা ছাড়া ওয়াজিব আদায় হয় না তাও ওয়াজিব।

শাইখ আদেল আব্বাস রাহিমাহুল্লাহর বাণী

হে জিহাদের সাথী! আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমার উচিৎ ইসলামের পতাকাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং দীনের বিজয় কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত ধাবাবাহিকভাবে পথ চলা, যেভাবে তোমার পূর্ববর্তীরা এই পথে

মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং তুমি এই পথে চলতে থাকো, যাতে তুমি ইলাহি পরীক্ষায় সফলতা লাভ করতে পারো। নিশ্চয় শেষকালই ধর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না তোমাদের থেকে মুজাহিদ ও ধৈর্যধারণকারীদের সম্পর্কে অবগত হতে পারি এবং যতক্ষণ না তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।'

শাইখ আবু মুসআব আবদুল ওয়াদুদ হাফিজাহুল্লাহর বাণী

কখনোই যুদ্ধ ছাড়ব না

বিশ্বের প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! যে উসামার জন্য লড়াই করত; নিশ্চয়ই উসামা মারা গিয়েছেন। আর যারা দীন, ভূমি, সম্মান ও উম্মাহ রক্ষার জন্য লড়াই করত, তাদের জন্য যুদ্ধের সময় এসে গেছে। অগ্নিকুণ্ড উত্তেজিত হচ্ছে। রয়েছে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলমান। সুতরাং দৃঢ় হও, দৃঢ় হও এবং ধৈর্য ধরো ও ধৈর্য ধরো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের জন্য বিজয়ের ফায়সালা করেন অথবা আমরা শহিদ হয়ে প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের সাথে সাক্ষাৎ করি।

শাইখ আবু ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহর বাণী

হয়তো জিহাদ নয়তো লাঞ্ছনা, যা ইচ্ছা বেছে নাও

জিহাদের কাজে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত হওয়া, দায়িত্ব সম্পাদন করা, কষ্ট সহ্য করা ও ধৈর্যের সাথে সকল কার্যক্রম আদায় করা আবশ্যক। কিন্তু মন এগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং জমিনের ভোগ-সামগ্রীর প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়ে ও তার সৌন্দর্য-মোহে আবিষ্ট হয়ে গভীরে প্রোথিত হয়ে যায়। কারণ, যুদ্ধের অগ্রভাগে রয়েছে মৃত্যু ও ভয়ানক বিপদ। আর দুনিয়ার পশ্চাতে রয়েছে ধন-সম্পদ ও পরিবার। হয়তো সেদিকে ঠেলে দেয়া হবে অথবা এদিকে টেনে আনা হবে। যদিও জিহাদের পথে যা ব্যয় ও

সহ্য করবে তার প্রতিদান অনেক ভাল। কিন্তু নফস সর্বদা তাড়াহুড়াপ্রবণ এবং চায় দ্রুততা; সব জিনিস নগদ ভোগ করতেই ভালোবাসে; কষ্ট করে ফসল ভোগ করতে চায় না। অতএব হয়তো জিহাদ নয়তো লাঞ্ছনার জীবন, যা ইচ্ছা বেছে নাও।

শাইখ কমান্ডার আবু মুসআব যারকাবি রাহিমাহুল্লাহর বাণী

সাহায্য অবতরণ

এটিই আল্লাহ তাআলার রীতি যে, অপশক্তির বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়া এবং কাফির সংঘগুলোর সাথে অব্যহত সংগ্রাম করা। কেননা জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন ও আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন থেকে উন্নতি সম্ভব নয়, যাতে সে এখন নিপতিত। এই দীন আমাদের ভূমিতে কখনো শিকড় ছড়াবে না যতক্ষণ না উম্মাহ তার সন্তানদের রক্ত দ্বারা একে সিঞ্চিত করবে, যেভাবে পূর্ববর্তীগণ একে সিক্ত করেছে; এবং পূর্ববর্তীগণের হাতে যেভাবে দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে দীন আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না আমরা তাদের মতো বিসর্জন দেব।

শাইখ নসর বিন আলী আল আনাসি রাহিমাহুল্লাহর বাণী

অবশ্যই শরিয়া প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাব

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমরা কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়ে মূল লক্ষ্যকে ভুলে যাব না এবং বর্তমানকে অতীতের সাথে মিলিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হব না; বরং আবশ্যক হচ্ছে, আমরা শরিয়া কায়েমের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাব, যা শুধু মুসলিমদের নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির অধিকার আদায়ের দায়িত্ব নেবে। এই শরিয়া-ব্যবস্থা যা নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা, উম্মাহর ভূমিতে নেতৃত্ব, ইসলামি বিধান দ্বারা সুশৃঙ্খল ইনসাফকে বাস্তবায়ন করে; মুক্ত থাকবে শাসকের স্বৈরাচার থেকে, দায়িত্ব নেবে ভাল কাজে নির্দেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের। [সাক্ষাৎকার]

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ লিবি রাহিমাহুল্লাহর বাণী

সর্বাবস্থায় আমরা সুসংবাদপ্রাপ্ত। ইমারা প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমরা সঠিক পথের ওপর চলছি। জিহাদ চলমান রয়েছে এবং তা শক্তিশালী ও বিস্তৃত হচ্ছে। পক্ষান্তরে দুশমনদের হচ্ছে অধঃপতন; বৃদ্ধি পাচ্ছে তাওহিদবাদীদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর গোলাবর্ষণ, আলহামদু লিল্লাহ। যদিও বাস্তবিক অর্থে আমাদের ইমারত ও হুকুমতের সময় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; কিন্তু আমরা সঠিক পথের ওপর রয়েছি, এটাই মূল বিষয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।

ইসলামের লড়াইয়ের বাস্তবতা

এই যুদ্ধ হচ্ছে হক ও বাতিলের, তাওহিদ ও কুফরের, ইসলামের সৈনিক এবং ফ্রান্সের সৈনিক ও পশ্চিমা বস্তুবাদী নাস্তিক, যারা দীনে ইসলামকে অস্বীকার করে তাদের দোসর তথা ক্রীতদাসদের সাথে। এই সংগ্রাম ওই সকল পুত-পবিত্র মাজলুমদের, যারা নিজেদের ভূমিতে স্বাধীন হয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর নির্দেশ-মোতাবেক শাসন এবং তাঁর ইবাদতের অধিকার প্রত্যাশী; এবং সৈরাচার সীমালঙ্ঘনকারী জালিম সম্প্রদায়ের মাঝে যারা পাগল, পাপী ও খেয়ানতকারীগোষ্ঠী, তাদের বিরুদ্ধে। সুতরাং বর্তমান লড়াই একেবারে সুস্পষ্ট, তবে সে ব্যতীত যার দৃষ্টিকে আল্লাহ ঢেকে দিয়েছেন।

শাইখ আবু সুফিয়ান আসদি রাহিমাহুল্লাহর বাণী

জামাত এমন মানহাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কোনো ব্যক্তির জীবন এবং মৃত্যুতে পরিবর্তন হয় না। এই বৈশিষ্ট্যই আল্লাহ তাআলা সাহাবিদেরকে প্রথম যুগে দ্বিতীয় যুদ্ধ উহুদ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুলের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হলো এবং তা সৈন্যদলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ তাআলা সাহাবিদেরকে স্পষ্টভাবে শিক্ষা দিলেন 'মুহাম্মাদ তো একজন রাসুলই, তাঁর পূর্বেও গত হয়েছে বহু রাসুল। তাহলে কি তিনি যদি

মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপদ হবে?' তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন, যাতে দাওয়াতের কার্যক্রমকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দাওয়াহ্ ও আল্লাহর নির্ধারিত সময় সম্পূর্ণ হয়েছে, যার হিকমত একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন; কিন্তু মানহাজ বাকি থাকবে এবং তাঁর দায়িত্ব এমন ব্যক্তিরা গ্রহণ করবে যাদেরকে আল্লাহ অশেষ করুনায় তাওফিক দান করবেন।

শাইখ ড. শহিদ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম রাহিমাহুল্লাহর বাণী

অবশ্যই তোমাকে জানতে হবে যে, জিহাদের পথ হচ্ছে অনেক কঠিন ও দীর্ঘ। অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এই সফর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। শুরুতে অনেকেই আবেগি হয়; আর জিহাদের কঠিন পরিস্থিতির জন্য আবেগের সাথে নফসকে কঠিন বিপদ সহ্য করতে হবে এবং কষ্ট ও মসিবতের ওপর নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। অনেক যুবক আবেগ নিয়ে জিহাদে আসে। অতঃপর তাদের আবেগ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সে মূল জিহাদের হুকুম নিয়ে বিতর্ক শুরু করে দেয়।

শাহাদাত

যখনই আমার কাছে কোনো শহিদের সংবাদ আসে, তখন নিজেকে অনেক ছোট মনে হয় এবং চিন্তা করি, যদি আমি সে-অবস্থানে পৌঁছাতে পারতাম তাহলে আল্লাহ আমাকেও শাহাদাত দান করতেন। এতদসত্ত্বেও আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যের আশাবাদী, যেন তিনি আমাদের অপরাধ ও ত্রুটির কারণে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করা থেকে বঞ্চিত না করেন। *[স্মরণিকা]*

ফিলিস্তিনকে ফিরিয়ে আনা ঈমানের অংশ

যদিও আমরা কঠিন সীমান্ত, নিষেধাজ্ঞা, শিকল ও বেড়িরুদ্ধ কারাগারে থেকে ফিলিস্তিনের জিহাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, এর অর্থ এ নয় যে, আমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি। আমরা আকসা-ভূমিকে ভুলি নি। ফিলিস্তিনকে ফিরিয়ে আনা আমাদের ঈমানের অংশ, যা আমাদের অস্তিত্বে প্রবাহিত হয়।

শাইখ সুলাইমান আবুল গাইস রহিমাহুল্লাহর বাণী

নিশ্চয় সফলতা মুমিনদের জন্য

বর্তমান সময় হচ্ছে, ক্ষমতার পালাবদলের। কখনো কাফিরদের ওপর মুসলিমদের ক্ষমতা আসে আবার কখনো আসে মুসলিমদের ওপর কাফিরদের ক্ষমতা। তবে বিজয় কখনোই সদা এক দলের সাথে থাকে না। তবে নিশ্চিতরূপে বিজয়ের সর্বশেষ পালা মুমিনদের জন্যই হয়ে থাকে।

﴿كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ﴾

'আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি এবং আমার রাসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব।' [সূরা আহকাফ, আয়াত : ২১।]

সত্যিকার মুমিন ও নিষ্ঠাবান মুজাহিদ কখনো আল্লাহর শরিয়াকে খণ্ডিত করে না; পূর্ণ শরিয়া পালন করে এবং প্রথম ধাক্কায় পরাজিত হয় না। প্রথম পরীক্ষা ও বিপদের পালায় তাদের দৃঢ়-সংকল্প দুর্বল হয় না; বরং তা হচ্ছে এই দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলারই সুন্নাহ। এক দিন তোমার পক্ষে অন্য দিন তোমার বিরুদ্ধে।

শাইখ কাসেম আর-রিমি হাফিজাহুল্লাহর বাণী

কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলবে

হে কুফফার! তোরা কোনো ব্যক্তি তো নয়ই, কোনো দল বা তানজিমের সাথেও যুদ্ধ করছিস না; বরং তোরা আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিস, যার হিফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

﴿اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ﴾

'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাজিল করেছি আর আমিই তাঁর হিফাজত করব।' [সূরা হিজর, আয়াত : ৯।]

সুতরাং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কারো মৃত্যুর দ্বারা ধ্বংস হওয়া আর কারো জীবিত হওয়ার দ্বারা চালু হবে না। আমাদের থেকে যাকে

হত্যা করা হয় সে শহিদ বলে গণ্য হবে। আর প্রত্যেক শহিদের রক্ত দ্বারা আল্লাহ একের পর এক বহু দল জীবিত করেন। আর আমাদের প্রত্যেক নিখোঁজ মুজাহিদের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে দেন অগণিত ইসলামি ঘোড়সওয়ার।

কমান্ডার আবদুল আযিয মুকরিন রাহিমাহুল্লাহর বাণী

নিশ্চয় বন্দিদের জন্য রয়েছে অঢেল প্রতিদান, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ধৈর্য্যের সাথে অটল ও স্থির থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

'কোনো হিসাব ছাড়াই ধৈর্যশীলদের প্রতিদান পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে।'[55]

তারা তাদের সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু চেষ্টা করেছে; ফলে তাদের থেকে সেই দায়িত্বভার নেমে গেছে যা জিহাদ ত্যাগকারীরা রেখে দিয়েছে আর মুজাহিদরা গ্রহণ করে নিয়েছেন। বন্দিরা অতিক্রান্ত জিহাদি পথের স্বভাব বুঝে গিয়েছে, যে কষ্ট ও বিপদ এই পথের জন্য আবশ্যক। সেজন্যই তারা নিজেদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু আমরা মুসলিমদের অবস্থা কী? আমরা আল্লাহর দীনের জন্য কী পদক্ষেপ নিয়েছি? এই বন্দিদের জন্য কী করেছি, যারা আমাদের বিজয়ের জন্য লড়ছেন, আমাদের থেকে শত্রুদের প্রতিহত করছেন এবং আমাদের দীন ও দুনিয়া রক্ষার জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন? [প্রবন্ধ : বন্দিরা আমাদের নিকট আমানত]

শাইখ মুখতার আবু জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহর বাণী

মুজাহিদদের বলব, তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলিমদের ভূমি থেকে কুফফারকে তাড়িয়ে দেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।' [সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৯।]

---

55. সূরা যুমার : ১০

তাদের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ করতে থাকো; তীব্র হামলা করো। তাদের আরাম-আয়েশকে বিনষ্ট করে দাও। তাদের জন্য পথে-ঘাটে ওঁৎ পেতে থাকো, ঘাঁটিগুলোতে অতর্কিত হামলা করো, রসদের পথ বন্ধ করে দাও এবং ইসতেশহাদি হামলার মাধ্যমে তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে নিশ্চিহ্ন করে দাও।

শাইখ আমির আসেম ওমর রাহিমাহুল্লাহর বাণী

সঠিক মানহাজেই জিহাদের সফলতা

যদি তোমাদের জিহাদ আল্লাহর দেয়া পদ্ধতি মোতাবেক হয়ে থাকে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বলে দেয়া পদ্ধতি মোতাবেক হয়ে থাকে, তাহলে না তোমরা দুর্বল হবে, না পিছু হটবে, না কাপুরুষতা দেখাবে আর না জীবন দেয়া থেকে ঘাবড়িয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

'আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না। তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।' [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৯।]

দুনিয়া তোমাদের পদতলে। দুনিয়ার শাসনক্ষমতা তোমাদের হাতে দেয়ার মালিক আল্লাহ। শীঘ্রই দুনিয়ার নেতৃত্ব তোমাদের হাতে আসবে। জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটেই।

আকাবির কি কম বুঝতেন?

আমি কখনো চিন্তা করি...আমাদের আকাবির কি বেশি বুঝতেন যে, তারা উম্মাহর বীরদেরকে উঠিয়ে নিয়ে বালাকোটের প্রাঙ্গনে শহিদ করে দিয়েছেন? না-কি আমরা যারা নিজেদের জান বাঁচানো নিয়ে ব্যস্ত আছি?!!! আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, শাহ আবদুল আযিযের মতো মুহাক্কিক-মুহাদ্দিস এটাও অনুভব করেন নি যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার ঐতিহাসিক ফাতওয়া তাদেরকে কত কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দেবে? না-কি ওনার এই (হেকমতের) বুঝ ছিল না যে, তারা এই জিহাদের আমলের কারণে গোটা হিন্দুস্তানের লক্ষ মাদরাসার একটা একটা করে ইট গুঁড়িয়ে দেয়া হবে?

পরিশেষে এমন কী আবেগ ছিল যাতে দিল্লির সুবিশাল ইলমের খেদমত আদায়কারী মাদরাসাগুলোকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছেন। ফলে তিনি নিজেও বিপদগ্রস্ত হয়েছেন এবং মাদরাসাগুলোও ধ্বংস হয়েছে?!

শাইখ আবুল হাসান আল বালিইদি তাকাব্বালাহুল্লাহর বাণী

আছে কি কেউ সাড়া দেবে জিহাদের পথে, জান্নাতের পথে?

যে শুধু নিজেকে নিয়েই থাকে সে অনেক আরামেই জীবনপাত করে; কিন্তু সে বাঁচে অপদস্থ হয়ে এবং মরেও ছোট হয়ে। বস্তুতঃ বড় সেই যে মহান দায়িত্ব বহন করে। সে আল্লাহ তাআলা ও বড়দের দৃষ্টিতে বড় হয়েই বাঁচে এবং সম্মানের মৃত্যুবরণ করে। চিরকাল অবশিষ্ট থাকে তার কর্ম ও কথন। মৃত্যুর আগেই যার পক্ষে একটা হকের চারা রোপণ সম্ভব সে যেন তা রোপণ করে নেয়। যে কৃপণতা করবে সে নিজের ওপরই কার্পণ্য করল। যখন জুলুমের আঁধার কেটে ভোর উদয় হবে, উম্মাহ তখন সেই গাছের নির্মল বায়ুর প্রশংসা করবে।

শাইখ ফারেস আজ জাহরান রাহিমাহুল্লাহর বাণী

হে জাযিরাতুল আরবের দক্ষিণের অধিবাসীগণ! ইসলামি বিশ্বের মাঝে তোমাদের শহর অবস্থিত; যাতে রয়েছে মুসলিমদের কিবলা মক্কা ও মদিনা। যাকে বিশ্বের সম্পদশালী সমুদ্র ও নৌপথ বেষ্টন করে রেখেছে এবং যেখানে রয়েছে সবচেয়ে বড় পেট্রোল-ভাণ্ডার। সুতরাং তুমি কি সন্তুষ্ট যে, ক্রুসেডার ও তার এজেন্টরা তোমাদের ভূমিতে আধিপত্য করবে? তোমাদের সম্পদ ও ফসল লুটতরাজ করবে? আর তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে? আর কত কাল তোমরা এই জুলুমেও চুপসে থাকবে? কত কাল তোমাদের সন্তান ও স্ত্রীগণ জাযিরাতুল আরবের তাগুতগোষ্ঠীর জেলখানায় আবদ্ধ থাকবে?

শাইখের পরবর্তী বই শীঘ্রই আসছে